দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা।। ১৫ জুন, ২০২৬।। ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

২০ জুন

পশ্চিমবঙ্গ দিবস

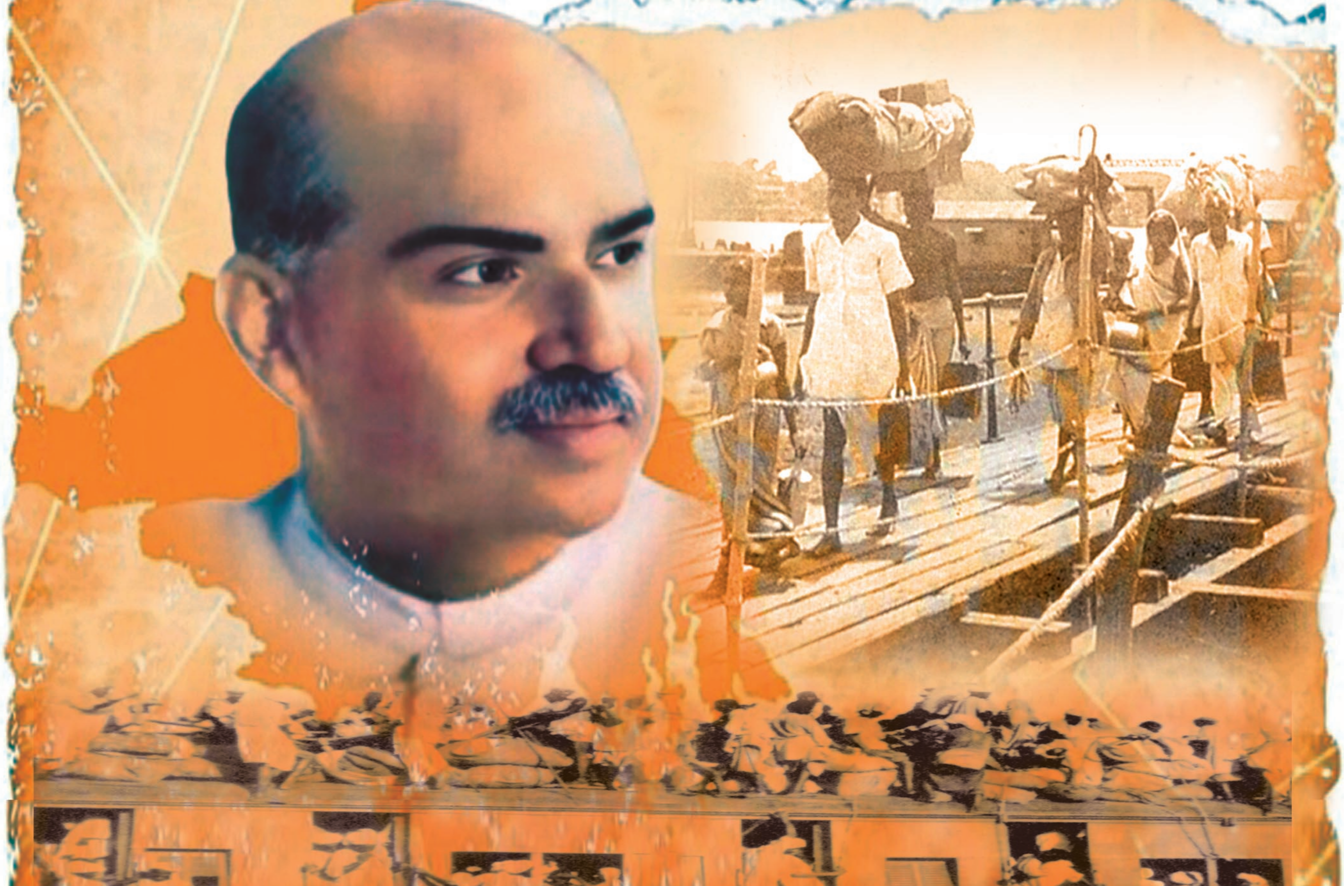

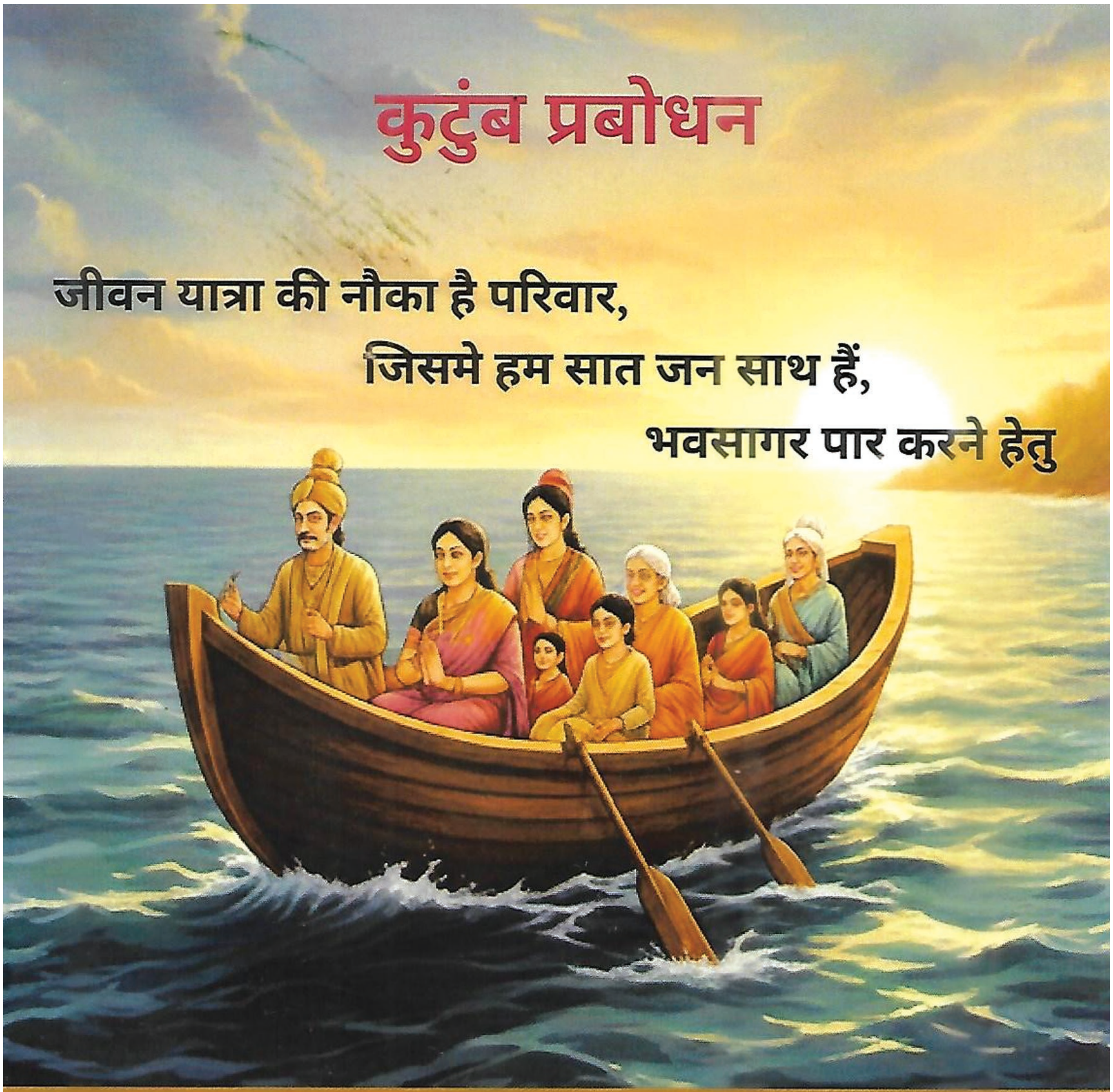

लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

১৫ জুন - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

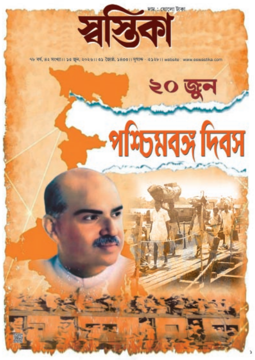

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

নীচ আর নীতিহীন শাসক মৃতবৎ হয়, তার ধ্বংস অনিবার্য : 'কয়েদি হাজির' ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কিছু কীর্তিকলাপ ◻ রাণার চট্টরাজ ◻ ৭

বামপন্থীদের হিন্দু বিদ্বেষ—ভারতবর্ষে একটি চোরা স্রোত ◻ সুদীপ্ত কুমার পাত্র ◻ ৮

বাঙ্গালিকে কেন '২০ জুন, ১৯৪৭'-এর ইতিহাস জানানো হয়নি? ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিবস : ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে স্বীকার করে না কেন কংগ্রেস? ◻ দীপল বিশ্বাস ◻ ১১

বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি পশ্চিমবঙ্গ এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান ◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ১৪

২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' সরকারি ভাবে রাজ্য সরকারকে ঘোষণা করতে হবে ◻ মোহিত রায় ◻ ১৬

এসআইআর রায়ের সুপ্রিম ব্যাখ্যা : যে রায় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে ◻ উতঙ্ক ব্যানার্জী ◻ ১৮

বাঙ্গালি হিন্দুর ত্রাতা পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ২৩

অরণ্যষষ্ঠী—রূপে অরূপে ◻ পরিব্রাজক ◻ ৩১

সমুদ্র, নদী ও একশো বছরের বঙ্গদেশ ◻ ড. সৌম্যজিৎ রায় ◻ ৩৫

বড় কাঁচা নাটক : খেলতে নেমে ওয়াকওভার দিতে হলো তৃণমূলের তথাকথিত যুবরাজকে ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ৩৭

দেশে দেশে একটি গোপন ও সমান্তরাল প্রশাসন হিসেবে সক্রিয় দ্য গ্লোবাল ডিপ স্টেট ◻ গিরিরাজ দে ◻ ৪৩

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস কেন? ◻ ড. সম্রাট গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ৪৬

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন : জনক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ◻ প্রণব দত্ত মজুমদার ◻ ৪৮

গল্প কথায় ডাক্তারজী ◻ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ◻ খেলা : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২২ জুন
২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২২ জুন
২০২৬

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ

ঘোর ইসলামি শাসনের মধ্যে হিন্দু পদপাদশাহি প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষের হিন্দু জাতিকে স্বাধীনতাস্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। নিজের জন্য নয়, স্বরাজ্য ও সুরাজের জন্য লড়াই করে হিন্দু জাতিকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

স্বাস্তিকার আগামী সংখ্যায় তাঁর রাজ্যাভিষেক তিথি উপলক্ষ্যে সেই হিন্দু যোদ্ধার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ দিবস

মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন কিংবা তেত্রিশ বৎসর বয়সে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্য হইয়াছিলেন বলিয়াই কি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালি স্মরণে রাখিবে? উপাচার্য থাকাকালীন তাঁরই আমন্ত্রণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাংলায় ভাষণ দিয়াছিলেন অথবা তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-সহ অন্য দুইটি ভারতীয় ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়াছিলেন বলিয়া বাঙ্গালি তো তাঁহাকে স্মরণে রাখিবেই, কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ কারণে বাঙ্গালি তাঁহাকে স্মৃতির মণিকোঠায় স্থান দিয়াছে, তাহা হইল তিনি বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জিন্না-সুরাবর্দির কূটচাল বিধ্বস্ত করিয়া পাকিস্তানের কবল হইতে বঙ্গভূমির হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমাংশ লইয়া 'পশ্চিমবঙ্গ' নামক রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজন দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এক চরম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হিসাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ সেই বিভাজনের বিপক্ষে রহিলেও মুসলিম লিগের গুন্ডামির নিকট কংগ্রেস মাথা নত করিয়া তাহা মানিয়া লইয়াছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের কারণে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর প্রাণহানি ঘটিয়াছে, লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাতা-ভগিনীর সম্ভ্রমহানি ঘটিয়াছে এবং কোটি কোটি হিন্দুকে উদ্বাস্তু হইতে হইয়াছে। ভারত বিভাজনের সহিত ভারতের সেনাবাহিনী, বিভিন্ন মন্ত্রক-সহ সরকারি দপ্তর, উচ্চপদস্থ আধিকারিক-সহ রেল ও কেন্দ্রীয় কোষাগারও বিভক্ত করিয়া পাকিস্তানকে দিতে হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও পাকিস্তান ও জেহাদি মুসলমানদের ভারত তথা হিন্দু বিরোধিতার সমাপ্তি ঘটে নাই। ভারত বিভাজনের সহিত বঙ্গ বিভাগ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানকে বিভাজন করিয়া যিনি অর্ধেক বঙ্গভূমি ছিনাইয়া লইয়া বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ইতিহাস এবং তাহার স্রষ্টাকে দশকের পর দশক গোপন রাখা হইয়াছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, যুক্তবঙ্গ গঠনের নামে সমগ্র বঙ্গ জিন্নাকে উপহার দানের যে চক্রান্ত সুরাবর্দি করিয়াছিলেন, নেতাজী অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর ন্যায় ব্যক্তিও সেই ফাঁদে পদার্পণে উদ্যত হইয়াছিলেন। দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ সেই চক্রান্তের বিরুদ্ধে গর্জিয়া উঠিয়া এক বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালির সৌভাগ্য যে, সেদিন তাঁহার প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন মুসলিম লিগের আপত্তি সত্ত্বেও আইনসভার ভোটে ৫৮ জন হিন্দু সদস্যের ভোটে পশ্চিমবঙ্গের ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পাকিস্তানের কবল হইতে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনাইয়া লইতে প্রবল আন্দোলন সংগঠিত করিতে হইয়াছিল ড. শ্যামাপ্রসাদকে। অসুস্থ শরীরে তখন তাঁহাকে দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অদম্য প্রচেষ্টার ফলে সেইদিন অখণ্ড বঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমাংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'পশ্চিমবঙ্গ' নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই দিন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যগণও শ্যামাপ্রসাদকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা লোভী কংগ্রেস কোনোদিন শ্যামাপ্রসাদের সেই অবদানকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবার সাহস পায় নাই। শ্যামাপ্রসাদের জনপ্রিয়তার কারণে চিরকাল তাহারা বিরোধিতা করিয়াছে। দেশদ্রোহী কমিউনিস্টরা তো সেই ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। প্রবল জনসমর্থনের কারণে সেদিন তাহাদের নেতা জ্যোতি বসু এবং রতনলাল ব্রাহ্মণ শ্যামাপ্রসাদকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আর কোনোদিন তাহারা এই কথাটি স্বীকার করেন নাই। হিন্দু বাঙ্গালির অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি পশ্চিমবঙ্গের ভারতভুক্তির ন্যায় মহান কার্যটির জন্য যেখানে প্রতিটি বাঙ্গালির শ্যামাপ্রসাদকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত ছিল সেখানে বাঙ্গালির মানসপট হইতে দশকের পর দশক তাঁহাকে নির্বাসিত রাখিবার কার্যটি করিয়াছিল বাম-সেকুলার ইতিহাসবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ। রাজনৈতিক হিন্দু শ্যামাপ্রসাদকে তাহাদের বড়োই ভয়। তাহাদের স্বীকার করিতে বড়োই ভয় যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পর শ্যামাপ্রসাদই একমাত্র বাঙ্গালি যিনি একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যে দলের রাজনৈতিক উত্তরসূরী আজ ভারত এবং ভারতের অধিকাংশ রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। শত চেষ্টা করিয়া তাহারা বাঙ্গালি মানস হইতে শ্যামাপ্রসাদকে নির্বাসিত করিতে পারে নাই বরং তাহাদেরই আজ নির্বাসনে চলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। '২০ জুন' অনেক আন্দোলন, অনেক পরিশ্রমের ফল। সেকু-মাকুরা কোনোদিন সেই দিনটিকে স্বীকার করেন নাই। বহু বৎসর পর বাঙ্গালি তাহার শিকড়ের সন্ধান পাইয়াছে। 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' এবার সরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হইবে।

সুভাষিতম্

ধূমায়ন্তে ব্যপেতানি জ্বলন্তি সহিতানি চ।
ধৃতরাষ্ট্রোল্মুকানীব জ্ঞাতয়ো ভরতর্ষভ।। (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ৩৬।৬০)

অর্থঃ হে ধৃতরাষ্ট্র! ইন্ধন আলাদা আলাদা থাকলে কেবল ধোঁয়া নির্গত হয়ে থাকে। কিন্তু একসঙ্গে হলে প্রজ্বলিত হয়ে থাকে।

নীচ আর নীতিহীন শাসক মৃতবৎ হয়, তার ধ্বংস অনিবার্য

‘কয়েদি হাজির’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে লোকনাট্য ‘কয়েদি হাজির’ বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রচিত এই নাটক বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনকে ঘিরেই লেখা হয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে তার নতুন রূপ দেখা দিয়েছে। এ রাজ্যের পূর্ববর্তী শাসকদলকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এখন নম্বরের খেলায় নামতে হয়েছে। কার দেরাজে কত কঙ্কাল জমেছে তার হিসাব হচ্ছে। কয়েদিদের যেমন নামের বদলে নম্বর হয়, পুরোনো শাসক দলের ভিতর তাই চলছে। বিধানসভায় জাল নামের তালিকা পেশ হয়েছে। তারপর থেকে নামের চেয়ে নম্বরের উল্লেখ বেশি। নামের বদলে নম্বর চর্চাই চলছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ‘বিরোধী দলনেতা’ মনোনয়নের জাল তালিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে রাজ্যে আর কেন্দ্রে নেতারা দল ছেড়ে আলাদা অস্তিত্বের দাবি জানাচ্ছে। বিধানসভায় ৮০ জন তৃণমূল বিধায়কের ভিতর ৫৮-৬০ জন ইতিমধ্যেই কয়েদ ছেড়ে মুক্ত বাতাস পেতে দল থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

সংসদেও তাই হতে চলেছে। লোকসভা আর রাজ্যসভা মিলিয়ে ৪১ জন সাংসদের ভিতর একটা বড়ো সংখ্যা (২৮ থেকে ৩০ জন) পর্যায়ক্রমে দল ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। দলের আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করে পুরোনো শাসকের নির্বাচনী প্রতীক তারা কেড়ে নিতে চান। শীঘ্র তারা অন্যদের ‘নকল’ বলে ঘোষণা করবে। নির্বাচন কমিশন সে দাবির বিচার করবে। তাতে গণতন্ত্র কতটা রক্ষা হবে তা না ভেবেও এটা বলা চলে যে দুরাত্মারা দুর্বল হয়ে পড়বে।

যা হোক চোরের দল হিসেবে তারা যে তকমা পেয়েছে তা কোনোদিন মুছবে না তা হলফ করে বলা যায়। সময়কালে দুরাত্মা কর্পূরের মতো উবে যাবে। কিংবা রাজনীতিতে ব্যবহৃত হবে। বিদেশি বামেদের সংগঠিত হিংসা আর দুর্নীতির বিপ্রতীপে তারা অসংগঠিত হয়ে কাজ চালাত। এখন প্রমাণ হচ্ছে পূর্ববর্তী শাসকের (তৃণমূল কংগ্রেসের) ধ্বংস কেন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গত ৪ মে তাদের উপড়ে ফেলে দেয় রাজ্যের ভোটার। সে বার্তা নতুন সরকারকে কার্যকরী করতে হবে। নাহলে অশরীরী পাপাত্মার জাগরণ হতে পারে।

২০১১ সালে তারা ক্ষমতায় এসেছিল প্রতিবাদী দল হিসাবে। অচিরে সে প্রতিবাদ ফুরিয়ে যায়। প্রচার-সর্বস্ব দল হয়ে তারা দুর্নীতি আর হিংসার ঘেরাটোপে নিজেদের ঘিরে ফেলে। চোরের দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি যে কতটা ন্যক্কারজনক হতে পারে তার দলিল তারা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছে। মন্দের ভালো। তাতে ভবিষ্যতে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল অজান্তেও সে পথে পা বাড়াবে না। এতো গেল ভবিষ্যতের কথা। আগের শাসকের ৩৭ জন নেতা-মন্ত্রীর জেল যাত্রার পর আবার নতুন করে কলকাতা পুরসভার ৭ জন পুরপিতাকে হুমকি দেওয়া, ভয় দেখানো, মারধর-সহ তোলাবাজি ও বিভিন্ন তছরুপের অভিযোগে পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। ‘ধেড়ে ইঁদুর’ ধরা না পড়লেও তার জেলযাত্রা অবশ্যম্ভাবী।

ভারতীয় জনতা পার্টি এ রাজ্যে এমন এক সময় ক্ষমতায় এসেছে যখন সারা দেশে এই রাজ্যের বহুধা বদনাম করে গিয়েছে পুরোনো শাসকদল। রাজ্যকে ‘হিন্দু হোমল্যান্ড’ বানানোর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে গেলে তাদেরকে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বা সংস্কৃতিমনস্ক দল হিসাবেও কাজ করতে হবে। নজরে রাখতে হবে যে, তাতে বেনোজল না প্রবেশ করে। আর রাজনৈতিক পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ না হয়। তবে এটা অবশ্য বলা চলে যে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ রাজ্যের ভোটাররা জল মাপার মতো করে মাপবেন। যে ধরনের বিচারধারা ও জনসমর্থন নিয়ে তারা ক্ষমতায় এসেছে তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে এরাজ্যের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভোটাররা তাদের যে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে তা পূরণ করতে হবে। পা ফসকালেই সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা।

দেশজুড়ে বিজেপি ইতিমধ্যেই নিজেদের একটি ব্যতিক্রমী দল বলে প্রমাণ করেছে। ফলে বিজেপি বিরোধী ইন্ডিজোটের গঙ্গাযাত্রা প্রতিদিন একটু করে এগোচ্ছে। তামিলনাড়ুতে ডিএমকে পাশ্চাত্যবাদী কংগ্রেসকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলে ইন্ডিজোট থেকে সরে গিয়েছে। ২০২৭-এ সাতটি রাজ্যে ভোট রয়েছে। তার ভিতর পাঁচটি বিজেপি-শাসিত রাজ্য।

পশ্চিমবঙ্গের সদ্য প্রাক্তন শাসকদলকে ইন্ডিজোটের কোনো শরিক বিশ্বাস করে না। ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে তারা কেবল অবিশ্বাসের প্রমাণ রেখেছে। দুর্নীতি, লুঠতরাজ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, দেশদ্রোহিতা, প্রবল অত্যাচার ও ব্যভিচারের কারণে রাজ্যের ভোটাররাও তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন ‘কয়েদি’ হিসেবেই তাদের নেতা-নেত্রীদের মানুষ দেখতে চান। তা যত শীঘ্র সম্ভব হয় রাজ্যের ভোটার আর মানুষ তাতে আশ্বস্ত হবেন।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কিছু কীর্তিকলাপ

রানার চট্টরাজ

তৃণমূল নেতা প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু বিকাশ ভবনের আনাচে কানাচে 'অদৃশ্য মন্ত্রী' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে চোখে সচরাচর দেখা যেত না। সপ্তাহে খুব বেশি হলে দু'দিন অফিসে আসতেন, তাও বিকেল ৪ টার পর, যখন সাধারণ কর্মচারীরা গৃহে প্রত্যাবর্তনের মুখে। সরকারি আধিকারিকরা ফাইল নিয়ে মন্ত্রীর সন্ধানে এসে ফিরে যেতেন। মন্ত্রী নেই। শিক্ষা বিভাগে এক চূড়ান্ত অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এর সুযোগ নিয়ে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব রাজ্য সিভিল সার্ভিসের আধিকারিক শিবাজী ঘোষ চূড়ান্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মন্ত্রীরও এককাঠি উপরে যেতেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও তার বিরুদ্ধে উঠেছে। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী একজন প্রতিভাবান নাট্যকার, চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা। তাই সম্ভবত তিনি মন্ত্রিত্বের কাজে মনোযোগ দিতে পারেননি। তবে মন্ত্রী হতে গেলেন কেন? ২০০৮-এ সিপিএম থেকে গণমুক্তি পরিষদ এবং অধ্যাপক সুনন্দ সান্যালের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে প্রবেশ করেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে পড়ে যান। ব্যস্, ২০১১-তে বিধায়ক ও ক্যাবিনেট মন্ত্রী। এই বিষয়ে বলার কিছু নেই। তবে তিনি এমন কিছু কীর্তি করেছেন, যেটা ক্ষমা করা সম্ভব নয়।

১৮৫৪ সাল থেকে শিক্ষা অধিকর্তা (Director of Public Instruction বা DPI) নিয়োগের ব্যাপারে যে প্রথা অনুসরণ করা হয়েছে, সেটি হলো সরকারি কলেজের 'প্রফেসর' পদমর্যাদার কোনো বরিষ্ঠ অধ্যাপককে এই পদে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ব্রাত্যবাবু প্রথম ১৭২ বছরের প্রথা ভঙ্গ করে 'প্রফেসর' নন এখন একজনকে ডিপিআই হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। নাম মধুমিতা মান্না। বিধাননগর কলেজের অধ্যক্ষা থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক নিয়ম বহির্ভূত কাজের অভিযোগ উঠেছিল। বিধাননগর কলেজের আগে তিনি বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। সেই সময় Laboratory-র জন্য জিনিসপত্র কেনার বিষয়ে স্বয়ং কলেজের অধ্যক্ষা ড. সংগীতা ত্রিপাঠী মধুমিতা মান্নার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। তিনি লিখিতভাবে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তাকে জানান। আশ্চর্যের বিষয়, অধ্যাপিকা মান্নার বিরুদ্ধে তদন্ত করার পরিবর্তে সংগীতাকে বেথুন কলেজ থেকে রাতারাতি বদলি করে দেওয়া হয়। তিনি এখন চন্দননগর সরকারি কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে আরও বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এত অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মধুমিতা মান্নাকে অতিরিক্ত শিক্ষা অধিকর্তা (প্রশাসন) পদে নিয়োগ করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মধুমিতা মান্নার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ সংবলিত একটি স্মারকলিপি জুলাই ২০, ২০১৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অধস্তন সচিব কমিশনের পূর্বাঞ্চল শাখার যুগ্ম সচিবকে পাঠান (চিঠির নম্বর F.22-2/2017 (ERO)/RO)। যুগ্ম সচিব বিষয়টি ২৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জানান (চিঠির নম্বর F.Complaint-02-022/2018 (ERO)\। বিধাননগর কলেজটি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অবস্থিত। ২০১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বাসব চৌধুরী সমস্ত কাগজপত্র রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব, উচ্চশিক্ষা বিভাগকে পাঠিয়ে দেন (চিঠির নম্বর— WBSU/V.C./1377/18)। তার কোনো তদন্ত হয়নি। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যবাবুকে সব জানানো হয়েছিল। তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরিবর্তে অভিযুক্ত অধ্যাপিকাকে প্রথমে অতিরিক্ত শিক্ষা অধিকর্তা (প্রশাসন), তারপর সমস্ত রীতি-নিয়ম ভেঙে দিয়ে শিক্ষা অধিকর্তা করে দিলেন। কেন? কীসের জন্য?

এছাড়া প্রাক্তন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে ব্রাত্যবাবু বসিয়েছেন। ব্রাত্যবাবু তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষা সেলের সভাপতি হিসেবে তিনজন অধ্যাপককে সহসভাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। তারমধ্যে একজন পঞ্চায়েত নির্বাচনে (বামফ্রন্ট আমলে) উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে সিপিএম প্রার্থী হিসেবে পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। দ্বিতীয় সহসভাপতি এই শতাব্দীর প্রথম দিকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপিএম নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশনের নেতা হিসেবে সিপিএম বিরোধী জাতীয়তাবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের মারধোর করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন। আরও আশ্চর্য, এই 'মহান' নেতাকে ব্রাত্যবাবু কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক করেছিলেন। অবশ্য অচিরেই অসদাচরণ, দুর্ব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগে তাকে অপসারিত হতে হলো। এই ধরনের আরও কিছু তথ্য অদূর ভবিষ্যতে কোনো প্রবন্ধে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইলো। ▯

বামপন্থীদের হিন্দু বিদ্বেষ ভারতবর্ষে একটি চোরা স্রোত

সুদীপ্ত কুমার পাত্র

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাটি যাদের মুখে সবচেয়ে বেশি শোনা যায়, তাঁদের একটি বড়ো অংশের আচরণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এক গভীর হিন্দু-বিদ্বেষ। নিজেদের 'বামপন্থী' বা 'প্রগতিশীল' বলে দাবি করলেও তাদের মূল লক্ষ্য যেন কেবল সনাতন ধর্ম, তার দর্শন, আচার-আচরণ ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বলে প্রমাণ করা। ইসলামি শাসনকালে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পর ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের যৎসামান্য অংশ টিকে আছে গুরু-পরম্পরা এবং কিছু পণ্ডিতের ব্যক্তিগত সংগ্রহে। সেই টুকু জ্ঞান নিয়ে আলোচনা না করে, বামপন্থীরা কেন কেবল একটি বিশেষ প্রশ্নে এত উৎসাহী তা চিন্তার বিষয়। তারা যে বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করে তা হলো— 'বৈদিক যুগে ঋষি-মুনিরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন।' গোবংশ হিন্দুদের কাছে এক পবিত্র প্রাণী, ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। তাই হিন্দুদের এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতেই এই কৃত্রিম বিতর্ক সৃষ্টি করা হয়।

(১) হিন্দু সহনশীলতার অপব্যবহার : সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো সহিষ্ণুতা। ধর্মবিশ্বাসে আঘাত এলেও হিন্দুরা সাধারণত হাতে অস্ত্র তুলে নেয় না, সমাজচ্যুত করে না, বরং যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারাই প্রতিবাদ জানায়। এই সহনশীলতাকে পুঁজি করে বামপন্থীরা বছরের পর বছর একই মিথ্যা বারবার প্রচার করে চলেছে— 'বৈদিক হোমে পশুবলি', 'ঋগ্বেদে গোহত্যার উল্লেখ রয়েছে' ইত্যাদি। গোয়েবলসীয় নীতিটি তারা ভালোই জানেন— 'একটি বড়ো মিথ্যাকে যদি যথেষ্ট দীর্ঘকাল এবং যথেষ্ট উদ্যমে পুনরাবৃত্তি করা হয়, তবে মানুষ তা সত্য বলে মেনে নেবে।'

উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিক দশকগুলিতে তথাকথিত কিছু ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ ও লেখক ইংরেজি ও বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এমনভাবে বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন যাতে সাধারণ পড়ুয়ার মনে সন্দেহ জাগে যে আদৌ হিন্দুধর্মে গোরু পবিত্র কিনা। অথচ সেই একই লেখকেরা মুসলমান বা খ্রিস্টানদের খাদ্যাভ্যাস বা আচার নিয়ে কখনো প্রশ্ন তোলেন না। তাদের এই দ্বিচারিতা ও নির্বাচিত প্রতিবাদ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে তাদের লক্ষ্য কেবল হিন্দু সমাজকে মানসিকভাবে দুর্বল করা।

(২) শাস্ত্রীয় প্রমাণঃ গোরু 'অঘ্ন্যা' ও 'অহি' : বেদ ও উপনিষদের প্রকৃত জ্ঞান যাঁরা অধ্যয়ন করেন, তাঁরা জানেন যে বেদে গোরুকে কখনোই হত্যা করা নয়, বরং দেবীস্বরূপে পূজা করার কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ১০১তম সূক্তে গোরুকে 'অঘ্ন্যা' (যাকে বধ করা উচিত নয়) বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। যজুর্বেদের ১৩.৪৯ মন্ত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

মা হিংসীঃ স্বধিতিম্ গামশ্বং পুরুষং পশুম্ । (অর্থাৎ , গোরু, অশ্ব, মানুষ এবং অন্যান্য পশুকেহত্যা করো না।)

অথর্ববেদেও গোহত্যার বিরুদ্ধে কঠিন বাক্য আছে। গোহত্যাকে মহাপাপ বলা হয়েছে এবং তা থেকে মুক্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত নির্ধারিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (ঋণ ২৬৩) বলে— 'যে ব্যক্তি গোমাংস খায়, সে কুম্ভীপাকে পচে মরে এবং পুনর্জন্ম পেলে কৃমি জন্মপ্রাপ্ত হয়।'

তাহলে প্রশ্ন, বেদের এত স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও বামপন্থীরা 'গোমাংস ভক্ষণ' প্রমাণের জন্য কেন এত মরিয়া? তারা সাধারণত ঋগ্বেদের ১০/৮৫/১৩ মন্ত্রটি টেনে আনেন। সেখানে আছে , 'হন্যতে গাবো'। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে 'গো' শব্দের অর্থ কেবল 'গোরু' নয়। প্রসঙ্গ অনুযায়ী এর অর্থ 'জিহ্বা', 'বাণী', 'পৃথিবী', 'দিক', 'নেত্র', এমনকী 'ইন্দ্রিয়' পর্যন্ত হতে পারে। সেই মন্ত্রটি বিবাহ সূক্তের অন্তর্গত, যেখানে বর ও কনের মানসিক শুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সেখানে 'হন্যতে গাবো' বলতে বোঝানো হয়েছে 'বাক্যের দোষ দূর করা', গোহত্যা নয়। প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে শব্দের বিকৃতি ঘটানো বামপন্থীদের অভ্যাস।

(৩) 'গোঘ্ন' ও 'অতিথি' শব্দের কূটব্যাখ্যা : অন্য একটি সাধারণ অপপ্রয়াস হলো— সংস্কৃত শব্দ 'গোঘ্ন' (গো + ঘ্ন) অর্থাৎ 'গো-হন্তা'কে অতিথির প্রতিশব্দ দেখানো। বলা হয়, প্রাচীনকালে অতিথি এলে তাঁর সৎকারের জন্য গোবধ করা হতো। কিন্তু আপস্তম্ব ও গৌতম সূত্র স্পষ্ট জানায়, অতিথি এলে 'গো-প্রদান' অর্থাৎ গাভী উপহার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাঁকে হত্যা নয়। মনুস্মৃতি (৩/১০১) বলে— 'অতিথি' এলে গৃহস্থকে 'গো, শয্যা, আসন, অন্ন' দ্বারা সম্মান দেখাতে হবে।

'গোঘ্ন' শব্দের একটি অর্থ ধনুকভঙ্গকারীও হয়। বাস্তবে বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। মাংসভোজনের অনুমতি ছিল কেবল শূদ্রদের নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে, তাও বলির মাধ্যমে, যা পরবর্তী স্মৃতিগ্রন্থে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়।

যদি সত্যিই বৈদিক কালে গোমাংস এত জনপ্রিয় ছিল, তাহলে কেন পাণিনি, কৌটিল্য বা মেধাতিথি প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতেরা গোহত্যাকে ঘোর পাপ বলে গণ্য করেছেন? অশোকের শিলালিপিতেও গোহত্যা নিষিদ্ধের উল্লেখ রয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈনমতের প্রভাবে পরবর্তীকালে নিরামিষ আহার বাড়লেও বেদের মূল বার্তা ছিল 'সর্বভূতহিতে রত' এবং গোহত্যার কঠোর বিরুদ্ধতা।

(৪) ঐতিহাসিক নিদর্শন ধ্বংস এবং হারিয়ে যাওয়া পুঁথির প্রেক্ষাপট : বামপন্থীদের আরেকটি কৌশল হলো— 'হিন্দুরা বলতেই পারে, তাদের ধর্মগ্রন্থে গোমাংস নিষিদ্ধ, কিন্তু আমরা কোনো প্রাচীন পুঁথিতে তা দেখিনি।' বাস্তবতা হলো, তুর্কি আক্রমণকারীরা মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী, জগদ্দল— এই সব বিদ্যাপীঠ পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে। নালন্দার নয় লক্ষ পুঁথি সংবলিত গ্রন্থাগার আগুনে পুড়তে তিন মাস লেগেছিল। ইসলামি শাসনের সেই অমানবিক তাণ্ডবের

মধ্যে টিকে থাকা পুঁথিগুলো গুহায়, বাড়ির গোপন কুঠুরিতে, মঠের দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। নেপাল-সহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানাভাবে অনেক পুঁথিপত্র পৌঁছে যায়। তার ওপর ইংরেজ আমলে বহু পুঁথি চুরি হয়ে গেছে ইউরোপের জাদুঘরে।

বর্তমানে যৎসামান্য বেদ-পুঁথি রয়েছে— সেগুলো যথেষ্ট নয়। সেখানেও গোমাংস সমর্থনে কোনো প্রমাণ নেই। বরং আছে গোপালনের বিশদ পদ্ধতি, দুগ্ধজাত পণ্যের গুরুত্ব, গোমূত্র-গোময়ের ঔষধি গুণাগুণ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গোহত্যার শাস্তি— মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা রয়েছে!

(৫) অন্যান্য উপাসনা পদ্ধতি বিষয়ে কমিউনিস্টদের 'নির্বিকার' মনোভাব : সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো— বামপন্থীরা যখন অন্য কোনো উপাসনা পদ্ধতির কথা বলেন, তখন তাদের 'যুক্তিবাদ' কোথায় যেন ম্রিয়মাণ হয়। যদি কোনো ইসলামি দেশে 'কোরবানি'র সময় গোমাংস খাওয়া হয়, সেখানে বামপন্থীরা তীক্ষ্ণ সমালোচনা তো দূরের কথা, বরং সেটাকে 'ঐতিহ্য' বলে মেনে নেন। খ্রিস্টমতে 'লাস্ট সাপার'-এ ভেড়ার মাংসের উল্লেখ থাকলেও তারা বলেন 'এটা প্রতীকী'। কিন্তু হিন্দুধর্মে কোনো প্রাচীন মন্ত্রের একটি শব্দকে হাতিয়ে নিয়ে পুরো বৈদিক যুগকে 'মাংসাশী' প্রমাণ করতে তারা মরিয়া।

এই যে এত বড়ো পক্ষপাত, এটা আর 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নয় , এটা স্পষ্ট হিন্দু-বিদ্বেষের চোরা স্রোত। তারা হিন্দুদের গো-মাতাকে মাতৃরূপে পূজা করাকে 'অন্ধবিশ্বাস' বলে, কিন্তু অন্য উপাসনা পদ্ধতির একই রকম (বা আরও কঠোর) আচার নিয়ে মন্তব্য করতে ভয় পায়। তাদের 'সেকুলারিজম' আসলে 'সর্বধর্ম সমাদর' নয়, বরং 'হিন্দুধর্মের প্রতি অসমাদর'।

(৫) বৈদিক যুগের প্রকৃত জ্ঞান : উপেক্ষিত মহিমা— বেদ-উপনিষদের প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বমানবতার জন্য অমূল্য। ঋগ্বেদ বলেছে , 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (সত্য এক, পণ্ডিতেরা তাকে নানাভাবে বলেন)। 'আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ' (সর্বদিক থেকে কল্যাণকর চিন্তা আমাদের কাছে

হিন্দু সমাজের কর্তব্য— এই ধরনের অপপ্রচারকে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যে প্রতিহত করা। সেইসঙ্গে বেদের প্রকৃত জ্ঞান, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, পরিবেশতত্ত্ব, দান ও কর্মযোগ— তা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আসুক)। 'উদার চরিতানাং তু বাসুধৈব কুটুম্বকম্' (উদার চরিত্রসম্পন্ন মানুষের কাছে সমগ্র পৃথিবীই আত্মীয়)।

বেদে বলা হয়েছে 'স্পৃহায়া জায়তে দুখম্', ইচ্ছার বশীভূত হলে দুঃখ জন্মে। 'ধর্মে চ অর্থে চ কামে চ মোক্ষে চ সততং গতি', অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চার পুরুষার্থের পূর্ণ সমন্বয়ই বেদের শিক্ষা। অথচ এই গভীর দর্শন নিয়ে বামপন্থীরা কখনো আলোচনা করেন না। তাদের আগ্রহ শুধু একটিতে, 'কীভাবে প্রমাণ করা যায় যে হিন্দুরা আগে গোমাংস ভক্ষণ করত।' স্পষ্টতই, তাদের লক্ষ্য হিন্দু মানসিকতার ভিত আলগা করা।

(৬) মিথ্যার পুনরাবৃত্তির প্রমাণিত ফল : বহু বাংলা ও হিন্দি সাহিত্যে, কলেজের পাঠ্যসূচিতে, 'বৈদিক যুগে গোমাংস ভক্ষণের চল ছিল'— এই কথাটি শেখানো হয় কোনো ক্রিটিকাল অ্যানালিসিস ছাড়াই। বহু প্রাচীন পুঁথি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ইতিহাসরক্ষায় কিছু ফাঁক রয়েছে, কিন্তু সেই ফাঁক দিয়ে বামপন্থীরা নিজেদের কামনা-বাসনা ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তাঁরা তুলে ধরেন কিছু 'বিকল্প ইতিহাস', যেমন 'গোরু বলতে স্ত্রীজাতিক বোঝানো হয়েছে', 'হিন্দুরা শুরু থেকেই নিরামিষ ছিল না', 'বৈদিক যুগে মদ ও মাংস ছিল নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য' ইত্যাদি। প্রতিটি দাবির পালটা শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে, কিন্তু গণমাধ্যমে ততটা জায়গা পায় না। কারণ অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমও পক্ষপাত দোষে দুষ্ট।

(৭) বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা : আজ যখন গোরক্ষার নামে সামান্য হলেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা যায়, তখন বামপন্থীরা গোমাতার সেই পবিত্রতাকে 'রাজনৈতিক অস্ত্র' বলে চিহ্নিত করতে চান। কিন্তু গো-মাতা ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। জৈব চাষে সার ও কীটনাশক তৈরিতে গোবর-গোমূত্রের ব্যবহার, ডাইং ইন্ডাস্ট্রি, ঔষধ প্রস্তুতি, সবই বিজ্ঞানসম্মত। বৈদিক যুগে গোপালন ছিল কৃষির মেরুদণ্ড। গোরুকে 'রাষ্ট্রীয় পশু' বলার মধ্যে কুসংস্কার নেই, বরং কৃতজ্ঞতা ও বিজ্ঞান রয়েছে।

বামপন্থীরা যদি সত্যিই যুক্তিবাদী হতেন, তাহলে প্রথমে তারা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেন। কিন্তু তারা চুপ। কারণ তাদের 'হিন্দু বিদ্বেষ' প্রকৃতপক্ষে একটি আন্তর্জাতিক অ্যাজেন্ডা, ভারতের সনাতন শক্তিকে দুর্বল করে একটি নব্য-ধর্মনিরপেক্ষ অস্পষ্টতায় সমাজকে ডুবিয়ে দেওয়া।

'বৈদিক যুগে মুনি-ঋষিরা গোমাংস ভক্ষণ করতেন'— এই প্রোপাগান্ডা একটি মিথ্যার রাজনীতি মাত্র। প্রমাণ-ভিত্তিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বেদ-উপনিষদে গোহত্যার কোনো সমর্থন নেই, বরং গোহত্যাকে কঠোর পাপ বলা হয়েছে। বামপন্থীরা যে শব্দ ও প্রসঙ্গের বিকৃতি ঘটিয়েছেন, তা প্রতিটি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অগ্রাহ্য করেছেন।

হিন্দু সমাজের কর্তব্য— এই ধরনের অপপ্রচারকে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যে প্রতিহত করা। সেইসঙ্গে বেদের প্রকৃত জ্ঞান, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, পরিবেশতত্ত্ব, দান ও কর্মযোগ— তা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ইতিহাসের প্রকৃত সত্যটি যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হোক না কেন, সত্য চিরকালই জয়ী হয়, 'সত্যমেব জয়তে'। □

বাঙ্গালিকে কেন '২০ জুন, ১৯৪৭'-এর ইতিহাস জানানো হয়নি ?

মুসলিম লিগের অসমাপ্ত কাজ হলো— 'পশ্চিমবঙ্গ দখল', যা তারা ১৯৪৭-এ পারেনি। তাই ১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে তাদের অস্ত্র ছিল আল ত্বাকিয়া। অর্থাৎ নিজেদের একটা 'লিবারেল গ্রুপ' হিসেবে দেখানো এবং বাঙ্গালিদের ভুল পথে চালিত করার প্রক্রিয়া তারা গ্রহণ করে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর পর যা তাদের কাছে একটা বড়ো সুযোগ হিসেবে চলে আসে। ১৯৪৭-এর পর কেরলম তারা মুসলিম লিগের অফিস খুললেও পশ্চিমবঙ্গে খোলেনি। এখানে তারা কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় এবং তাদের অসমাপ্ত কাজ শুরু করে। প্রথমে সেকুলার পরিচিতি নির্মাণ, তারপরে শুরু হয় তাদের বিভিন্ন পলিসি প্রয়োগ এবং ২০১১ সাল থেকে ১৫ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় 'পশ্চিম বাংলাদেশ' বানিয়ে ছাড়া। এই অসামপ্ত কাজ করতে প্রথম যে পদ্ধতির আশ্রয় তারা নেয়, তা হলো বাঙ্গালিকে জানতে না দেওয়া বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস। ১৯০৫-এর আগে 'বঙ্গপ্রদেশ' বলতে কী বোঝানো হতো, ১৯১১-তে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর দুই বঙ্গ পুনরায় জুড়ে যাওয়ার পর কী হলো, ১৯৪৬-এ কেন কলকাতা ও নোয়াখালীতে ভয়াবহ হিন্দু নরসংহার হলো, ১৯৪৭-এ কেন ভারত তৎসহ বঙ্গ ভাগ হলো— সেটা ৯৯ শতাংশ বাঙ্গালিকে জানতে দেওয়াই হয়নি। এছাড়া ১৯৪৬-এর হিন্দু গণহত্যাকে 'দাঙ্গা' বলে চালানো, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ-ভারত সরকারের অধীনে স্বায়ত্তশাসন চলাকালীন বঙ্গপ্রদেশে কৃষকপ্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগ শাসনের ইতিহাস না জানানো ইত্যাদি ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ১৯৪৩ সালে মুসলিম লিগের নেতৃত্বাধীন সরকার অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশে যে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালিকে না খাইয়ে মারে সেই ইতিহাস চেপে দেওয়া, মুসলিম লিগ সরকারের অধীনস্থ পুলিশ যে হিন্দু গণহত্যায় সাহায্য করে সেই ইতিহাস না জানানো এবং কীভাবে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'পাকিস্তান'- এর হাত থেকে হিন্দু বাঙ্গালির বসবাসের জন্য এই ভূমিখণ্ডটি ছিনিয়ে আনেন— সেই ইতিহাস গোপন করাতে তারা সফল হয়।

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাজগৎ দখল করতে শুরু করে বামপন্থীরা। ঋষি অরবিন্দের স্বপ্নের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭০-এ তাণ্ডব চালায় অতিবামেরা। তৎকালীন উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেনকে হত্যা করে বামপন্থীরা সরকারিভাবে দখল নেয় শিক্ষাজগৎ। এরপর মুছে ফেলা হয় বাঙ্গালির গৌরবের ইতিহাস। মহারাজা বিজয় সিংহ, মহারাজা শশাঙ্ক, ধর্মপাল, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্য, বীর চিলা রায়, রাজা কংসনারায়ণ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র থেকে শুরু করে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম থেকে বাদ যেতে থাকে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা সবাই। ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদদের পক্ষ থেকে শেষ বাদ দেওয়া অধ্যায় হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইসলামি শাসনের রক্তাক্ত ইতিহাস মুছতে বাঙ্গালিকে শেখানো শুরু হয় মিথ্যা 'এক বৃন্তে দু'টি কুসুম' তত্ত্ব। বঙ্গীয় সংবাদমাধ্যম যেহেতু বামপন্থীদের দখলে ছিল, তাই সত্য লুকোতে তাদের খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। একদিকে বঙ্গীয় সিনেমা, থিয়েটার বাঙ্গালির মস্তিষ্ক-প্রক্ষালন করে, অন্যদিকে বাঙ্গালিদের হাত থেকে ভু-সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয় জমিদারি প্রথা তুলে দিয়ে এবং ভূমি সংস্কার আইন এনে। জাতীয়করণের নামে এবং 'মিশ্র অর্থনীতি'র উদ্ভব ঘটিয়ে শেষ করে দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসাম্রাজ্য। সবুজ বিপ্লব থেকে বঞ্চিত করা হয় পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সমাজকে। রাজ্য সরকার-পোষিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষাশিক্ষা তুলে দেওয়া হয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও অফিসে কম্পিউটার ঢুকতে বাধাদান করা হয় যাতে শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা রাজ্য ছাড়ে। এরই সঙ্গে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশ-কারীদের ঢালাও ভাবে দেওয়া হয় এদেশের ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি। পালটে দেওয়া হতে থাকে এরাজ্যের জনবিন্যাস।

কিন্তু ১৯৪৭-এর প্রায় ৮০ বছর পর সারা পৃথিবীর বাঙ্গালি ঘুরে দাঁড়ায়। আমেরিকা থেকে মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর থেকে পাটনা, গুরুগ্রাম থেকে আমেদাবাদ, দিল্লি থেকে ভুবনেশ্বর— সব জায়গার বাঙ্গালি এক হয়ে ৯২ শতাংশ ভোট দিয়ে রক্ষা করে তাঁদের মাতৃভূমি। এটা একটা বিপ্লব। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাঙ্গালি এবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আর এই 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' মনে রাখতে হলে বাঙ্গালি জাতিকে মনে রাখতে হবে কোন পরিস্থিতিতে, কেন 'পশ্চিমবঙ্গ' তৈরি হলো। ১৯০৫-এ বঙ্গপ্রদেশের ভৌগোলিক সীমা কী ছিল? ১৯১১-তে কী হলো? ১৯৪৭-এ আবার কেন বঙ্গ বিভাজনকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষ ভাগ হলো? কীভাবে দেশভাগ হলো? গত ৮০ বছর ধরে তার ফল কী? এবার যদি 'পশ্চিমবঙ্গ'— পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত হতো, তাহলে নিশ্চিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি বাঙ্গালির হাতের বাইরে চলে যেত। সেক্ষেত্রে বাঙ্গালির কী ক্ষতি হতো? ১৯৪৭-এ রক্তাক্ত দেশভাগের পর সিন্ধি, কাশ্মীরি পণ্ডিত এবং পঞ্জাবি হিন্দু ও শিখদের কী পরিণতি হয়েছে এবং ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গ পুনরুদ্ধার না হলে আগামী ৫-১০ বছর পর কোথায় দাঁড়াতো বাঙ্গালি জাতি? বাঙ্গালির ইতিহাস কী, বাঙ্গালির ঐতিহ্য কী, বাঙ্গালির ভবিতব্য কী— জানতে হবে বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। তাই প্রতি বছর ২০ জুন পালন করতে হবে এই দিন— 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'। বছরে একদিন বর্তমান প্রজন্মের বাঙ্গালি স্মরণ করবে তার উৎস, পৃথিবীর বুকে যেখানে তার মাথা গোঁজার শেষ ঠাঁই— সেই হোমল্যান্ডের ইতিহাস। □

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্ম দিবস

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে স্বীকার করে না কেন কংগ্রেস?

কংগ্রেস সবসময় 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র মেকি নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে হিন্দুদের ন্যায্য দাবির প্রশ্নেও নীরবতা পালন করেছে। যেন 'নিরপেক্ষতা' মানে ন্যায়-অন্যায়ের ক্ষেত্রেও কোনো পক্ষ নেওয়া যাবে না।

দীপল বিশ্বাস

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও বঙ্গ বিভাগের বিস্তারিত বা ধারাবাহিক প্রয়োজনীয় তথ্য পড়ার সুযোগ পায়নি এরাজ্যের দেশভাগ পরবর্তী প্রজন্ম। অনেক ক্ষেত্রেই অন্যদের কথা বা কিছু রিপোর্টিং থেকে অনেকে এই বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে থাকেন, যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে সার্বিক নয়, ত্রুটিপূর্ণ, পরস্পর-বিরোধী। তাই অনেকের মনে বেশ কিছু প্রশ্ন জাগে যার উত্তর ঠিকমতো না পেয়ে ভুল ধারণা তৈরি হয়। অনেক সময় ভুল তথ্য কেউ দিলেও তার প্রত্যুত্তরে পালটা সঠিক তথ্য অন্যরা দিতে পারেন না। এই নিবন্ধে গভীর কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হলো।

(১) পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে, '১৫ আগস্ট ১৯৪৭'-এ পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে আমরা ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস কেন বলব?

এটার কারণ খুব পরিষ্কার যে, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে বঙ্গপ্রদেশ ভেঙে নতুন রাজ্য হিসেবে 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর যাত্রা শুরু হলেও এর সিদ্ধান্ত হয়েছিল ওই বছরের ২০ জুন বঙ্গের প্রাদেশিক আইনসভায় আনা তিনটি প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে।

(২) ১৯৪৭ সালে বঙ্গের আইনসভা কীরকম ছিল? কোন দলের ক'টি আসন ছিল? তিনটি প্রস্তাব কীভাবে ভোটাভুটি হয়েছিল?

১৯৪৭ সালের অবিভক্ত বঙ্গে প্রাদেশিক বিধানসভায় মোট আসন ২৫০-এর মধ্যে মুসলিম লিগ ১১৪, কংগ্রেস ৮৬, হিন্দু মহাসভা ২, সিপিআই ২, অন্যান্য হিন্দু ১৩, অন্যান্য মুসলিম ৮ এবং ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্য ছিলেন। পরিকল্পনা অনুসারে, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যরা বঙ্গবিভাগ করার প্রস্তাবে তিনটি পৃথক ভোট দেন :

বঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত হাউসের যৌথ অধিবেশনের ভোট বিভাজন (ডিভিশন) ছিল--- ১২৬টি ভোট বঙ্গবিভাগের বিপক্ষে এবং ৯০টি ভোট বঙ্গ বিভাগ করার এবং বিদ্যমান গণপরিষদে (ভারতে) যোগদানের পক্ষে। অর্থাৎ অবিভক্ত বঙ্গ বিধানসভা পাকিস্তানের যোগদানের প্রস্তাব পাশ করে।

এরপর দু'টি বিভক্ত বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ হয়।

পূর্ববঙ্গের মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যরা একটি পৃথক অধিবেশনে ১০৬-৩৫ দ্বারা বঙ্গ বিভাগ করার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাশ করে এবং একটি নতুন গণপরিষদে (পাকিস্তানে) যোগদান করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিম দিকের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যদের একটি পৃথক অধিবেশনে ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এখানে দু'টি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তৈরি করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে কিছু কুচক্রী।

(৩) বিধানসভায় মুসলমান সদস্যরা বঙ্গ বিভাগ করেনি, হিন্দু সদস্যরা বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছে, তাহলে উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে বঙ্গ বিভাগের জন্য দায়ী কে?

১৯৪৭-এর ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভায় ভোটাভুটির বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে সেটা মনে হতে পারে। কিন্তু যদি ভালোভাবে তিনটি প্রস্তাব পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, সংযুক্ত সভায় প্রথম প্রস্তাবটি ছিল অবিভক্ত বঙ্গ কোন দিকে যাবে, ভারতে নাকি পাকিস্তানে? সেই প্রস্তাবে বঙ্গীয় আইনসভার মুসলমান সদস্যরা পাকিস্তানে যাওয়ার পক্ষে ভোট দেয়, ফলত সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পুরো বঙ্গ পাকিস্তানে যাওয়ার পক্ষে প্রস্তাব পাশ হয়। অর্থাৎ ভারত ভেঙে উপাসনা পদ্ধতির ভিত্তিতে দেশভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান গঠনের পক্ষে প্রথম ভোট দেয়

ফঃ ২

মুসলমান সদস্যরা প্রথম প্রস্তাবে। এর উল্টোটা অর্থাৎ প্রথম প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ বঙ্গপ্রদেশ ভারতে থাকার পক্ষে পাশ হলে পরের দু'টো প্রস্তাবের ভোটাভুটির ফল উলটে যেত, অর্থাৎ হিন্দু সদস্যরা সম্পূর্ণ বঙ্গ ভারতে থাকার পক্ষে ভোট দিত আর মুসলমান সদস্যরা বঙ্গ বিভাগ করে পাকিস্তানে যাওয়ার পক্ষে ভোট দিত।

(৪) ২০ জুন ১৯৪৭ বঙ্গ বিধানসভায় 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রস্তাবের পক্ষে যে ৫৮ জন সদস্য ভোট দেন তার মধ্যে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দু মহাসভার মাত্র ২ জন সদস্য ছিলেন। অপরদিকে বেশিরভাগটাই কংগ্রেসের সদস্যরা ছিলেন। তাহলে কমিউনিস্টরা কীভাবে অপপ্রচার চালায় যে, বঙ্গ বিভাগ করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়?

এই প্রশ্নটির উত্তর একটু বিশদে না দিলে পরিষ্কার হবে না যে, 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টির কৃতিত্ব একমাত্র ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি নিজেও বলেছিলেন— 'Jinnah divided India, I divided Pakistan.' ১৯৪৭-এ বঙ্গ, পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে এবং সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের বিস্তারিত চর্চা হলেই এটা পরিষ্কার হবে। সকলের সত্যের উপলব্ধি হবে।

১৯৪৭ সালে সিন্ধু প্রদেশের জনবিন্যাস প্রায় বঙ্গের মতোই ছিল, সেখানে বিধানসভায় মোট ৬০ জন MLA-এর মধ্যে কংগ্রেসের ১৮ জন আর মুসলিম লিগের ২৮ জন ছিল। তাহলে সেইসব হিন্দুগরিষ্ঠ অংশের MLA-রা মিলে ভোট দিয়ে একটা 'পূর্ব সিন্ধু' ভারতে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বঙ্গ ও পঞ্জাবের মতো কোনো ভোটই ১৯৪৭-এ সিন্ধু বিধানসভায় অনুষ্ঠিত হলো না কেন? ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল বলেই তো ৫৮ জন MLA ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করেছিলেন এবং এখানেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান। আজ পাকিস্তানের শাসনাধীন সিন্ধু প্রদেশের কী অবস্থা হয়েছে? ১৯৪৭-এর পরেই সেখানে জনবিন্যাস পুরো পালটে গেল আর উদ্বাস্তু হিন্দু সিন্ধিরা রাজ্যহীন হয়ে ভারতে এসে বিভিন্ন রাজ্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়লেন। এটা যে বঙ্গের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে হবে সেটা তখনই বঙ্গের হিন্দুদের সতর্ক করে বোঝাতে পেরেছিলেন দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ। এখানেই তাঁর অবদান।

তিনি 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর সমর্থনে তারকেশ্বরে প্রথম সভা করেন। তারপর দলমত নির্বিশেষে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরাও পশ্চিমবঙ্গের সমর্থনে দিকে দিকে সভা সমিতি করতে শুরু করে। সেইজন্যই সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালিরা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল। তারা কংগ্রেসের এমএলএ-দের (আইনসভার সদস্যদের) চিঠি দিয়েছিল, কারণ বিধানসভায় কংগ্রেসের এমএলএ তখন বেশি ছিল। কংগ্রেসের নিজস্ব দাবি যদি এটা থাকবে তাহলে সাধারণ মানুষকে এমএলএ-দের চিঠি দিতে হবে কেন যে তোমরা দলের নীতি উপেক্ষা করে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ভোট দাও। এইজন্যই সভা-সমিতি, জনমতের চাপ যাতে কংগ্রেসের এমএলএ-দের উপর পড়ে সেই লক্ষ্যে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। আজ পাকিস্তানের বাসিন্দা হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুবরণের পরিবর্তে ভারতের মধ্যে মাথা গোঁজার ও বেঁচে থাকার ঠাঁই পেয়েছে হিন্দু বাঙ্গালি। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান না বুঝে তাঁকে অসম্মান, অবজ্ঞা করা হলো কমিউনিস্টদের অকৃতজ্ঞতা।

সংখ্যা দিয়ে সব হয় না যদি সেই জাতির স্বাভিমানবোধ ও দূরদর্শিতা না থাকে। বঙ্গের মতোই ১৯৪৭-এ সিন্ধু প্রদেশেও অধিকাংশ হিন্দু এমএলএ কংগ্রেসের ছিলেন, শুধু তাই নয়, তখন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন জেবি কৃপালনী। তিনি ছিলেন সিন্ধি, তাও কেউ 'পূর্বসিন্ধু'র দাবি তোলেননি। তার ফল ভুগতে হলো পরবর্তী প্রজন্মের হিন্দু-সিন্ধিদের। তাঁরা অনেকেই আর্থিকভাবে প্রভাবশালী হলেও ১৯৪৭-এর পর তাঁদের কোনো নিজস্ব রাজ্য নেই। পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী হিন্দু প্রজন্ম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান না বোঝার কারণ হলো ভারতের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে নেই। এই ইতিহাসকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। যাতে কোনোভাবে কংগ্রেসকে সমালোচনায় না পড়তে হয়। বঙ্গ, পঞ্জাব ও সিন্ধুর বেশিরভাগ হিন্দু এমএলএ কংগ্রেসের ছিলেন, কিন্তু হিন্দু হোমল্যান্ডের জন্য বঙ্গ বিভাগের দাবি প্রথম তুলেছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একমাত্র হিন্দু মহাসভা। তারই অনুসরণে শিখ ও হিন্দুদের জন্য পঞ্জাব ভাগের দাবি তুলেছিলেন অকালি নেতা মাস্টার তারা সিংহ, কিন্তু সিন্ধুতে কংগ্রেস ছাড়া হিন্দুদের আর কোনো দল ও প্রতিনিধি বিধানসভায় ছিল না, তাই সিন্ধু ভাগের দাবি উঠল না। কংগ্রেসের ২৮ জন এমএলএ-র কেউ সিন্ধু ভাগের দাবি তুললেন না, যদিও তখন ভারতের রাজস্থান সংলগ্ন পূর্ব সিন্ধু হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এখানেই তুলনা আসে ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি সিন্ধি নেতা জেবি কৃপালনীর। কংগ্রেসের ১৮ জন সিন্ধি এমএলএ হয়তো জেবি কৃপালনীর ভরসাতেই ছিলেন। ভরসাটা এই ছিল যে, তিনি যখন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি, তিনি যেহেতু সিন্ধের মানুষ, সুতরাং হিন্দু সিন্ধিদের স্বার্থ তিনি অবশ্যই রক্ষা করবেন। কী হলো তার ফল তা আজ জানে গোটা দেশ। ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭-এর পরে যখন জেবি কৃপালনী বুঝতে পারলেন যে ভুল হয়ে গেছে তখন তিনি দেশ বিভাগে নিজের অসন্তুষ্টি জানিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন, কিন্তু তখন পদত্যাগ করে কী লাভ হলো? হিন্দু সিন্ধিরা বরাবরের মতো রাজ্যহীন হলেন। গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে যারা তার মুখাপেক্ষী ছিলেন তাদের এরকম সর্বনাশ কোনো ভুল নয়, অপরাধ বলা যায়। আর কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি যদি অদূরদর্শী হন, তিনি যদি নিজের রাজ্যের হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষায় দাবি তুলতে না পারেন, তবে সেই রাজ্যের হিন্দুদের আর কী পরিণতি হতে পারে? বঙ্গ ও পঞ্জাবের ক্ষেত্রেও যদি হিন্দু মহাসভা বা অকালি দল প্রথমে দাবি তুলে জনমত তৈরি না করত, তবে কংগ্রেস বঙ্গভূমির হিন্দুপ্রধান অংশকে ভারতের মধ্যে ধরে রাখার দাবি নিজের থেকে তুলত না সেটা

স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই স্পষ্টত বলাই যায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে সেদিন 'পশ্চিমবঙ্গ' তৈরি হতো না।

কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু ও কৃষক প্রজা পার্টির (পরবর্তীতে মুসলিম লিগের) নেতা ফজলুল হক যে 'হিন্দু-মুসলিম' সংযুক্ত বঙ্গের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেটা কি ঠিক হয়েছিল? এটাও সহজেই বোঝা যাবে সংযুক্ত সিন্ধ প্রদেশের কথা চিন্তা করলে। হিন্দু সিন্ধিরা তো আলাদা সিন্ধু ভাগের কথা বলেনি। তারা মুসলমানদের সঙ্গে সংযুক্ত সিন্ধেই থাকতে চেয়েছিল। সেই সংযুক্ত সিন্ধের পরিস্থিতি ১৯৪৭-এর পর কী হলো সেটা পর্যালোচনা করলেই 'যুক্ত বঙ্গ'-এর পরিস্থিতি কী হতো তা সহজেই বোঝা যাবে। সিন্ধ ভাগের দাবি না ওঠার অন্যতম একটা কারণ পঞ্জাব ও বঙ্গের তুলনায় সিন্ধের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তুলনামূলক অনেক শান্ত ছিল। ১৯৪৭-এর আগে সেখানো বড়ো কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। কিন্তু ১৯৪৭-এর পরেই পরিস্থিতি পুরো পালটে গেল। ১৯৪৮-এর ৬ জানুয়ারি করাচি শহরে একই দিনে জেহাদিদের হাতে ৮০০ জন শিখ হত্যা হলো। নিরাপত্তার অভাবে হিন্দু সিন্ধিরা অবিভক্ত সিন্ধু ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসতে বাধ্য হলেন। যার ফলে সিন্ধ প্রদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ থেকে আজ কমে দাঁড়িয়েছে ৯ শতাংশে, যারা এখনও বাধ্য হয়ে সেদেশে টিকে রয়েছে, অমানবিক পরিস্থিতি সহ্য করে বেঁচে রয়েছে। ১৯৫১ সালের জনসংখ্যা অনুসারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ২২ শতাংশ। আজ সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশের নীচে। পরিসংখ্যান কথা বলে। মুসলিম লিগ প্রস্তাবিত 'যুক্তবঙ্গ'-এ হিন্দুদের পরিস্থিতি যে সিন্ধুর মতোই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেটা বুঝেছিলেন দূরদ্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মানুষকেও বুঝিয়েছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতার জন্য বাঙ্গালি হিন্দু রাজ্যহীন উদ্বাস্তু হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে।

প্রাদেশিক আইনসভা, ১৯৪৬					
প্রদেশ	কংগ্রেস	মুসলিম লিগ	অন্যান্য রাজনৈতিক দল	নির্দল	মোট
বঙ্গপ্রদেশ	৮৬	১১৩	ইউরোপীয় সদস্য-২৫ অন্যান্য-১২	১৪	২৫০
পঞ্জাব	৫১	৭৩	অকালি-২২ ইউনিয়নিস্ট পার্টি-২০ মজলিস-এ-আহরার-এ -ইসলাম-২	৭	১৭৫
সিন্ধু প্রদেশ	১৮	২৮	১০	৪	৬০

(৫) সিন্ধু ভাগ না চেয়ে অবিভক্ত সিন্ধে থেকে হিন্দু সিন্ধিরা যে প্রতারিত হলেন, সেই ভুল সংশোধনের কোনো চেষ্টা হয়নি কেন? তাদের মাতৃভূমির অধিকার আদায়ের কী উপায় আছে?

না, কোনোরকম চেষ্টা হয়নি। ভুল বুঝতে পারলে তবে তো সংশোধনের প্রশ্ন! সেই লক্ষ্যে কেন কোনো চেষ্টা হয়নি তার কারণ— স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে জওহরলাল নেহরু নেতৃত্বাধীন ভারতের শাসক দল কংগ্রেসের নীতি বা বলা ভালো নীতিহীনতা। কংগ্রেস সবসময় 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র মেকি নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে হিন্দুদের ন্যায্য দাবির প্রশ্নেও নীরবতা পালন করেছে। যেন 'নিরপেক্ষতা' মানে ন্যায়-অন্যায়ের ক্ষেত্রেও কোনো পক্ষ নেওয়া যাবে না। মুসলমানদের অন্যায়ের বিপক্ষে তো যাওয়াই যাবে না। এর ফলে ১৯৪৬-এর নির্বাচনে দেশজুড়ে হিন্দু প্রতিনিধি সব কংগ্রেসের হলেও তারা হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়েও সেই ট্র্যাডিশন চলতে থাকে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' হয়ে দাঁড়ায় মুসলমান তোষণের নামান্তর। দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত এই নীতি কংগ্রেসের বাইরেও শিক্ষিত, সাধারণ মানুষকেও প্রভাবিত করে— যেন অহিংসা মানে সংখ্যাগুরুর ন্যায্য দাবির পক্ষে কোনো কথা বলা যাবে না। পরে এটাই বামপন্থা, এলিটিজম্ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৭-এর পর পাকিস্তান স্থিতাবস্থা ভেঙে মুসলমানদের অধিকারের নামে কাশ্মীরের একাংশ দখল করলেও, সিন্ধি হিন্দুদের অধিকার আদায়ে ভারতীয় নেতৃত্ব সিন্ধের দাবিটুকুও করেনি। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে মুসলমানদের অধিকার আদায়ে যুদ্ধে জড়িয়েছে ভারত, পাকিস্তানের মানচিত্র পালটিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে রয়ে যাওয়া হিন্দুদের অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে কিছু করেনি, স্বচ্ছ নীতির অভাবে। ইহুদিরা যদি প্রায় ২০০০ বছর আগে বিতাড়িত হয়েও ১৯৪৮ সালে আবার তাদের দেশ ফিরে পেতে পারে, আর তাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমর্থন থাকে, তাহলে এখনও দেশভাগের সময় প্রতারিত সিন্ধি হিন্দুদের জন্য 'পূর্ব সিন্ধু'র দাবি হলো তাঁদের ৩০ শতাংশ পূর্বপুরুষের মাতৃভূমির অধিকার। একই ভাবে ১৯৫১ পরবর্তী পর্যায়ে ক্রমাগত দেশত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া ২২ শতাংশ পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু হিন্দুর উত্তরাধিকারীদের অধিকার রয়েছে তাঁদের মাতৃভূমির উপর আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই। কারণ এই একমুখী জনস্রোতের কারণ হিসেবে ১৯৪৭-এর দেশভাগকে পুরোপুরি দায়ী করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে উদ্বাস্তু মুসলমানদের কোনো স্রোত কিন্তু নেই, সেটা দুই দেশের জনসংখ্যা রিপোর্টেই স্পষ্ট। কিন্তু যেকোনো ন্যায্য অধিকরণ শক্তি প্রয়োগ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। ভারত দীর্ঘদিনের দুর্বল বিদেশনীতি কাটিয়ে বলিষ্ঠ বিদেশনীতির দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। তাই পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের পাশাপাশি আগামীতে এই দিকগুলোতেও ভারত সরকারের নতুন চিন্তাভাবনার প্রত্যাশা জনমানসে ঘনীভূত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন এর সঙ্গে ছিল, আছে, থাকবে। □

বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার ভূমি পশ্চিমবঙ্গ এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান

গোপাল চক্রবর্তী

১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ মুসলিম লিগের গুন্ডাদের হাতে নির্মম হিন্দু নিধনের পর থেকেই বঙ্গবিভাগ অর্থাৎ বঙ্গকে ভাগ করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুদের হোমল্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে। মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য 'হিন্দু মহাসভা' বঙ্গবিভাগের দাবি করে এবং এই দাবির সমর্থনে প্রচার শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল থেকে হুগলী জেলার তারকেশ্বরে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, ''যেহেতু মুসলিম লিগ বঙ্গদেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর, সেজন্য হিন্দুরাও বঙ্গে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করবে। বাঙ্গালি হিন্দুদের কাছে এটি একটি জীবন-মরণের প্রশ্ন। যদি হিন্দুদের পছন্দমতো কোনো শাসনতন্ত্র না হয়, তাহলে তাদের হিন্দুবিরোধী সাম্প্রদায়িক শাসনের অধীনে দাসত্বের জীবনযাপন করতে হবে।''

তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে সুস্পষ্ট ভাবে বলেন,— 'আমরা বঙ্গবিভাগ করে হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নামে একটি পৃথক মাতৃভূমি চাই।'

৫ এপ্রিল তারকেশ্বরের হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বঙ্গ বিভাগের মধ্য দিয়েই সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব।'

তিনি বলেন, 'I can conceive of no other Solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let two major communities residing herein live in peaee and freedom.

উল্লেখ্য, প্রায় একই সময়ে বঙ্গের কংগ্রেসও বঙ্গবিভাজনের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে। লক্ষণীয় এই যে, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসের এই কার্যকরী সভায় উপস্থিত ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, কেসি নিয়োগী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ পিএন ব্যানার্জি, কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ, মাখনলাল সেন ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

২২ এপ্রিল ১৯৪৭ নতুন দিল্লির এক জনসভায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পাকিস্তান যদি গঠিত নাও হয়, মুসলিম লিগ যদি মন্ত্রী মিশন পরিকল্পিত দুর্বল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা মেনেও নেয়, তা হলেও বঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে।'

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার পৌষ, ১৩৫৩ সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়— ''গান্ধীজী গ্রুপ ভাঙ্গিয়া আসামকে স্বাধীন হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। মাইনরিটি মুসলমান ভারতে সেফগার্ড খুঁজিতেছে, সেই যুক্তিতে বঙ্গের হিন্দুর সেফ গার্ডের দাবি। সম্প্রতি বঙ্গের কয়েকজন নেতা পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী। কারণ বঙ্গের লিগ সংখ্যাধিক্য শাসনাধীনে, বাঙ্গালি হিন্দুর ধন, প্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নারীর মর্যাদা বিপর্যস্ত। সম্মেলন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ নামক প্রদেশ গঠনের দাবি জানাইতেছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ড. প্রমথনাথ বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।''

ভারত ভেঙে পাকিস্তান তৈরির জন্য মুসলিম লিগ যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং নির্মম সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে যেকোনো জোট বা আন্দোলন হিন্দুদের কাছে সাদরে গ্রহণযোগ্য। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে। একখানি পুস্তিকায় ড. শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন— In a pamphlet entitled ''Should Bengal be divided into two provinces.' (Syama Prasad Mukherjee papers, Speeches and writings by S.P. Mukherjee, Sri No. 6). Symaprasad Mukherjee refuled the argument that no government could possibly crush the Hindus who constitute 45% of the Bengal. He said it was not the numbers that mattered. What mattered was the system of administration and a glaring example was Hyderabad where 90% Hindus were groaning under a tyrannical rule. He defended his proposal for division of Bengal on practical as well as administrative grounds...''

ড. শ্যামাপ্রসাদের এই আপোশহীন দুর্বার আন্দোলনের ঢেউ দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো বঙ্গ তথা সমগ্র ভারতে। ভুক্তভোগী হিন্দু সমাজ যেমন এই আন্দোলনে উজ্জীবিত হলো, তেমনি সিঁদুরে মেঘ দেখলো দাঙ্গাবাজ মুসলিম লিগ এবং তাদের নেতারা। ড. শ্যামাপ্রসাদের এই আপোশহীন সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেরি হলো না। বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম লিগ নেতারা হঠাৎ ছোরা লাঠি ছেড়ে অহিংস ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গেলেন। অসহায় হিন্দুর রক্তে যার হস্ত রঞ্জিত সেই সুরাবর্দি বললেন তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীন সোনার যুক্তবঙ্গ গড়বেন। আর আবুল হাসিম বললেন, 'যুক্তবঙ্গে অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির বেহস্ত তৈরি হবে।'

এদের হলো কী? বঙ্গের ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখে এরা কি ভুল বকতে শুরু করেছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর ১৬ আগস্ট' এবং ১০ অক্টোবর ১৯৪৬ তারিখের ইতিহাসের রূপকার তো এই সুরাবর্দি আর হাসিম। এই হাসিম আর সুরাবর্দির আসল রূপতো মানুষের চেনা। ১৬ আগস্টের হিন্দু নরসংহারের পর এই সুরাবর্দি বোম্বাইয়ে বলেছেন,— "When a nation fights against another nation I cannot guarantee civilized conduct." আর এখন বঙ্গবিভাগের দাবি জোরদার হতেই তাঁর মুখে শান্তির ললিতবাণী ও সোনার বঙ্গ গড়ার জন্য হিন্দুদের প্রতি আকুল আবেদন? ক্রিপস সাহেবের সঙ্গে আলোচনাকালে সুরাবর্দি হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাকে ওয়াভেল 'A hymn of hate against the Hindus'— হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-কীর্তন বলে অভিহিত করেছেন। তাহলে কোনটা তার আসল রূপ?

হিন্দু মহাসভা বঙ্গীয় আইন পরিষদে দুটিমাত্র আসন পেলেও তারাই যে প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের হিন্দু জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে সেকথা বারোজ সাহেব প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন। আর সেই জন্য তিনি বামহস্তে হলেও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে অভিবাদন জানিয়েছেন।

ইংরেজ কূটনীতিবিদ বারোজ ভেবেছিলেন ঢাকায় কিরণশঙ্কর রায়ের জমিদারি স্বার্থের দুর্বলতায় এবং কলকাতায় শরৎ বসুর রাজনৈতিক পুনর্বাসনের আকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দিয়ে তিনি স্বাধীন বঙ্গের, পরিকল্পনা রূপায়ণ করে মুসলমানদের মনোরঞ্জন করে ব্রিটিশ বাণিজ্য সম্প্রসারিত করবেন। তার ফলে বঙ্গের হিন্দু স্বার্থ জলাঞ্জলি হলেও তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু তার এই স্বপ্নের পরিকল্পনার মূলে কুঠারাঘাত করলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। হিন্দু মহাসভা ক্ষীণশক্তি হলেও একমাত্র ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জোরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গের কংগ্রেস দলকে বঙ্গবিভাগ আন্দোলনে

যুক্তবঙ্গ হলেই সুরাবর্দি, ওসমান, আর কলুটোলা, কলাবাগান, রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, বেলেঘাটা, বেলগাছিয়া, খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জের মুসলমান গুন্ডার দল রাতারাতি অহিংসার পূজারি হয়ে যাবে, একথা অতি বড়ো পাগলেও বিশ্বাস করবে না। তাই ড. শ্যামাপ্রসাদের ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছিল। হিন্দু বাঙ্গালিরা তখন তাঁকেই একমাত্র পরিত্রাতা রূপে বেছে নিয়েছিল।

শামিল করতে পেরেছেন। দেশবিভাগ যখন অনিবার্য, তখন বঙ্গ বিভাগ করে যত বেশি সংখ্যক হিন্দুকে ভারতের মধ্যে রাখা যায় সেই প্রচেষ্টায় অপরাধ কোথায়? ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই কাজটিই করেছেন। তাই আজ তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গে বসে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর সেকুলারিজমের মহড়া দিচ্ছেন। তা না হলে তাদের দশাও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মতোই হতো, সর্বস্ব হারিয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে দয়াভিক্ষা করে দিন কাটাতে হতো। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই অভিশাপ থেকে বাঙ্গালিকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ যখন বঙ্গবিভাগের পক্ষে এবং স্বাধীন বঙ্গের বিপক্ষে প্রায় একক প্রচেষ্টায় ব্যাপক প্রচার ও জনআন্দোলন গড়ে তুলছেন, তখন শরৎ বসু জনসমক্ষে তাঁর সাধের স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেননি। বাড়িতে বসে বিবৃতি দিয়ে এবং চিঠি লিখে তাঁর বিরোধিতার কথা জানাচ্ছিলেন।

এই সন্দেহ অমূলক নয় যে যুক্তবঙ্গ হলেই সুরাবর্দি, ওসমান, আর কলুটোলা, কলাবাগান, রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, বেলেঘাটা, বেলগাছিয়া, খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জের মুসলমান গুন্ডার দল রাতারাতি অহিংসার পূজারি হয়ে যাবে, একথা অতি বড়ো পাগলেও বিশ্বাস করবে না। তাই ড. শ্যামাপ্রসাদের ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছিল। দিশাহারা হিন্দু বাঙ্গালি তখন তাঁকেই একমাত্র পরিত্রাতা রূপে বেছে নিয়েছিল। উল্লেখ্য, এই সময়ে বঙ্গবিভাগের সমর্থনে যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশেরও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বঙ্গ ও বঙ্গের বাইরে যে বাঙ্গালি হিন্দুরা ছিলেন তাঁরাও বঙ্গবিভাগের দাবিতে সক্রিয় হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে বঙ্গবিভাগের সমর্থনে যে জনসভা হয় তার প্রধান বক্তা ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সেখানে ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন ও বঙ্গবিভাগের সমর্থনে ভাষণ দেন। ৭ মে ১৯৪৭, বঙ্গের চার জন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্যার যদুনাথ সরকার, ড. মেঘনাদ সাহা, ড. শিশির মিত্র ও ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিস্টওয়েলের নিকট একটি তারবার্তা পাঠান যার মর্মার্থ ছিল— 'বাংলাদেশে একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এবং শিক্ষা, ব্যবসা ও শিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে বঙ্গদেশে যে সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীসভা রয়েছে তা আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থায় কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা প্রয়োজন।' এই ধরনের তারবার্তা তাঁরা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং স্যার জন অ্যান্ডারসনকেও পাঠিয়েছিলেন। আর এইসব কিছুর মূলেই ছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। □

২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস'

সরকারিভাবে রাজ্য সরকারকে ঘোষণা করতে হবে

মোহিত রায়

১৯৪৭-এর ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়। ১৯৩৫-এর কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড মেনে ১৯৩৭-এর নির্বাচন থেকে শুরু হলো বঙ্গের মুসলিম লিগের ইসলামি শাসন। স্বাধীনতা ও দেশভাগের আবহাওয়ায় তপ্ত হয়ে উঠল বঙ্গের ইসলামি অত্যাচার। ১৯৪৬-এর কলকাতা ও নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যার পর বঙ্গে হিন্দু বুঝে গেল আগামীদিনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বঙ্গে তাদের অবস্থা কী হবে। এগিয়ে এলেন ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সরব হলেন বঙ্গের মনীষীরা। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র, নমঃশূদ্র নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর বললেন বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড চাই। এই অবস্থায় এগিয়ে এলেন বঙ্গের কংগ্রেস নেতারাও— ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, অতুল্য ঘোষ। ১৯৪৬ সালের শেষে বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষক নেতা হেমন্ত কুমার সরকার এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গঠন করলেন 'বেঙ্গল পার্টিশন লিগ'। ৪ এপ্রিল, ১৯৪৭-এ তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হল বঙ্গ বিভাজনের জন্য বিশাল হিন্দু জনসভা। ৪ এপ্রিল বঙ্গীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ-সহ সকলেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন। মতুয়া মহাসঙ্ঘের নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গের গঠনের পক্ষে মতামত রাখেন। ২২ এপ্রিল, ১৯৪৭-এ তৎকালীন বঙ্গের সর্বপ্রধান সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকা জনমত সমীক্ষা প্রকাশ করে, যাতে দেখা গিয়েছিল যে ৯৮.৬ শতাংশ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবিকে সমর্থন করেছিলেন। ২৩ এপ্রিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে বৈঠক করে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবি বুঝিয়ে বলেন। এই দাবির যৌক্তিকতা বোঝানোর জন্য তিনি প্রচুর দলিল দস্তাবেজ ও মানচিত্র তৈরি করে নিয়ে যান এবং ভাইসরয়ের আপ্তসহায়ক সাহেবের কাছে জমা দিয়ে আসেন। মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবিতে হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের যৌথ উদ্যোগে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্বে ছিলেন প্রবাদপ্রতিম ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকার। এরপরে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবিতে প্রদেশ জুড়ে ৭৬টি জনসভা হয়।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা বঙ্গের ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের প্রশ্নে একমত হলো না। তখন হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে হলো পশ্চিমবঙ্গ আইন সভা এবং মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে হলো পূর্ববঙ্গ আইন সভা। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সমস্ত হিন্দু সদস্য, এমনকী বামপন্থী দলগুলোও পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেই ছিল। ওইদিনেই পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার সদস্যরা ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গভাগের পক্ষে এবং পাকিস্তানে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠন সুনিশ্চিত করেন। আইন সভায় সংখ্যাধিক্যের ভোটে পশ্চিমবঙ্গের ভারতভুক্তি নিশ্চিত হয়। যুক্ত বঙ্গের সব মুসলমান সদস্য পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেন, কতিপয় তপশিলি সদস্য ছাড়া অন্যান্য সব তপশিলি সদস্য-সহ সব হিন্দু সদস্যরা ভারতভুক্তির পক্ষে ভোট দেন। ১৯৪৭-এর ২০ জুন জন্ম নিল পশ্চিমবঙ্গ। নব সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

বিভিন্ন রাজ্যে 'রাজ্য দিবস' পালিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে কোনো রাজ্য দিবস ছিল না। গত প্রায় ৮০ বছর ধরে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলমান তোষণের ফলে 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'পশ্চিমবঙ্গের জন্য' চিন্তাগোষ্ঠী ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের কাজটি শুরু করে। প্রথম প্রকাশ্য 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালিত হয় ২০১৪ সালের ২০ জুন কলেজ স্কোয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে। সন্ধ্যায় আয়োজিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন লেখিকা এষা দে, অধ্যাপক অচিন্ত্য বিশ্বাস, সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অধ্যাপক তথাগত রায় এবং এই প্রতিবেদক। সেই শুরু। ২০২০ সালে বিজেপি বিধায়ক দুলাল বর প্রথম বিধানসভা অধ্যক্ষকে এই দিবসটি বিধানসভায় পালনের জন্য আবেদন করেন। এটিই পশ্চিমবঙ্গের কোনো বিধায়কের '২০ জুন' পালনের

জন্য অধ্যক্ষকে প্রথম পত্র। ২০২২ সাল থেকে এরাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিধায়কদের নিয়ে কলকাতা ময়দানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি সংলগ্ন উদ্যানে প্রতি বছর ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদ্‌যাপিত হয়।

২০ জুন ২০২৬ : পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হল ৪ মে, ২০২৬ যখন জনসাধারণের বিপুল সমর্থন নিয়ে বিধানসভায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন জিতে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় এলো। এই জয়ের কাণ্ডারী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন যে, ২০ জুন সরকারিভাবে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদ্‌যাপিত হবে এবং এই সংক্রান্ত আদেশ বিধানসভার অধিবেশনে ঘোষিত হবে। এই দিবস পালনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে জানানো যাবে— বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড 'পশ্চিমবঙ্গ' রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামি মোল্লাবাদের বিপদ। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে এই কর্মকাণ্ড একান্ত জরুরি। 'পশ্চিমবঙ্গ' মানে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড, হিন্দুর নিরাপদ অস্তিত্ব, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং নারীর নিরাপত্তা।

এই দিবস পালন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে কিছু প্রস্তাব :

(১) স্বাধীনতা দিবসের মতো প্রতিটি মণ্ডলে, জেলায়, সাংস্কৃতিক সংগঠনে '২০ জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস' জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পালিত হোক।

(২) আইন করে বা বিধানসভায় প্রস্তাব এনে বিধিবদ্ধভাবে ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস রূপে ঘোষণা করা হোক। প্রতি বছর এই দিনটি বিধানসভায় পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হোক। বিধানসভা প্রাঙ্গণে একটি স্মারক স্থাপন করতে হবে এবং সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ভারতভুক্তির প্রস্তাবে যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের নাম লিপিবদ্ধ করা।

(৩) সংবাদপত্র-সহ সকল গণমাধ্যমে ওই দিনটি উদ্‌যাপনের জন্য আহ্বান করে বিজ্ঞাপন দেওয়া।

(৪) সরকারি আদেশ বা গভর্নমেন্ট অর্ডার জারি করে প্রতিটি সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদ্‌যাপন বাধ্যতামূলক করা। উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসেবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত বঙ্গমাতার প্রতিকৃতি ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, আলোচনা সভা, বিতর্ক, ছবি আঁকা প্রভৃতির আয়োজন করা এবং সেই উদ্‌যাপনের ছবি ও ভিডিয়ো সরকারি দপ্তরগুলিতে প্রেরণ।

(৫) আগামীদিনে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের পটভূমি ও তাৎপর্যকে বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা ও গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো।

সচেতন রাজ্যবাসী মনে করে যে, এভাবে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ ও জনসাধারণের কাছে 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর প্রকৃত অস্তিত্বের অর্থ, তার সৃষ্টির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে সবাই সচেষ্ট থাকবে।

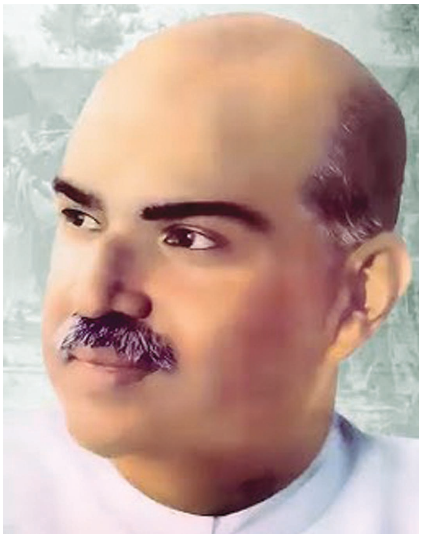

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে জানানো যাবে— বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড 'পশ্চিমবঙ্গ' রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামি মোল্লাবাদের বিপদ। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে এই কর্মকাণ্ড একান্ত জরুরি। 'পশ্চিমবঙ্গ' মানে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড, হিন্দুর নিরাপদ অস্তিত্ব, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং নারীর নিরাপত্তা।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

এসআইআর রায়ের সুপ্রিম ব্যাখ্যা : যে রায় ইতিহাসে স্মরণীয় থাকবে

উতঙ্ক ব্যানার্জী

ভারতের সর্বোচ্চ আদালত এমন রায় কমই দেয় যা একই সঙ্গে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অধিকার সুনিশ্চিত করে এবং একটি জাতীয় সংস্থাকে রক্ষা করে। গত ২৭ মে, ২০২৬ তারিখে Association for Democratic Reforms Vs. Election Commission of India মামলায় সর্বোচ্চ আদালত তাই করেছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী— ২৪ জুন, ২০২৫-এ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা বিহারের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) সংক্রান্ত আদেশ বহাল রেখেছেন। এই রায়ের মাধ্যমে আদালত ভারতীয় গণতন্ত্রকে এক বিরল উপহার দিয়েছেন— নির্ভুল ভোটার তালিকা কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়, বরং একটি সাংবিধানিক মূল্যবোধ।

পরিসংখ্যানই বাস্তব। এসআইআর শুরুর আগে বিহারের ভোটার তালিকায় ছিল ৭.৮৯ কোটি নাম। ঘরে ঘরে গণনা, কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী যাচাই ও আদালতের তত্ত্বাবধানের পর ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় ছিল ৭.৪২ কোটি ভোটার। খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়া ৬৫ লক্ষের মধ্যে ২১.৫৩ লক্ষ যোগ্য ভোটারকে কমিশন পুনঃঅন্তর্ভুক্ত করেছে; ৩.৬৬ লক্ষ পুনরায় বাদ দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারী পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন কপিল সিব্বল ও অভিষেক মনু সিংভি। তিনটি মূল আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। প্রথমত, যেখানে ভারতীয় সংসদ 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০'-এর মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করেছে, সেখানে সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদের আশ্রয় নেওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, ওই আইনের ২১(৩) ধারায় 'যেকোনো বিধানসভা ক্ষেত্র বা তার অংশ' বলা আছে— সারা রাজ্যজুড়ে ব্যাপক সংশোধনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তৃতীয়ত, যোগ্যতা যাচাইয়ের আড়ালে কমিশন আসলে নাগরিকত্ব নির্ধারণ করেছে, যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একচ্ছত্র এক্তিয়ার।

আদালত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সযত্নে। প্রথম প্রশ্নে আদালত Mohinder Singh Gill (১৯৭৮) ও A.C. Jose (১৯৮৪) রায় দু'টিকে তাদের যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করেছে। বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার কখনো বলেননি যে সংসদ আইন প্রণয়ন করলেই কমিশন নীরব হয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন কমিশনকে আইনের অনুসরণে কাজ করতে হবে, বিরুদ্ধে নয়। যেখানে সংসদ নীরব, কিংবা যেখানে ২১(৩) ধারার মতো স্পষ্টভাবে কমিশনকে বিবেচনার অধিকার দিয়েছে, সেখানে কমিশনের সাংবিধানিক ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ৩২৪ অনুচ্ছেদকে ৩২৭-এর প্রতিটি আইনের দ্বারা নিঃশেষিত হিসেবে পড়লে কমিশনকে নিছক একজন ডাকপিয়নে পরিণত করা হয়— যা সংবিধানপ্রণেতাদের অভিপ্রায় ছিল না। দ্বিতীয় আপত্তিতে আদালত পাঠ্যভিত্তিক চুলচেরা বিশ্লেষণের পরিবর্তে সাধারণ বুদ্ধির পথ বেছে নিয়েছে। বিহারের ২৪৩টি বিধানসভা ক্ষেত্রের প্রতিটির জন্য পৃথক বিজ্ঞপ্তি দাবি করা— যেখানে কারণগুলি (বাইশ বছরের পুঞ্জীভূত ভুল, পরিযান, নগরায়ণ, একই নাম একাধিকবার তালিকাভুক্ত হওয়া) সর্ব-রাজ্যব্যাপী— হবে বিষয়বস্তুর উপরে আকৃতিতে স্থান দেওয়া মাত্র। 'যেকোনো' শব্দটি পরিস্থিতি অনুযায়ী 'অনেকগুলি' বা 'সবগুলি' ক্ষেত্রও বোঝাতে পারে।

আনুপাতিকতা পরীক্ষায় রায়ের প্রকৃত পরিপক্বতা প্রকাশ পেয়েছে। চার-স্তরীয় বিশ্লেষণ— বৈধ উদ্দেশ্য, যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক, প্রয়োজনীয়তা ও ভারসাম্য— যান্ত্রিকভাবে নয়, যত্নসহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে। দু'দশকের সংক্ষিপ্ত সংশোধনের পর তালিকার নির্ভুলতা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য বৈধ, ঘরে ঘরে গণনা, নির্দিষ্ট ফর্ম ও দলিল- যাচাই ওই উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পৃক্ত। এসআইআর নির্দেশিকার অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা— স্ব-উদ্যোগে তদন্ত, কারণ-দর্শাও নোটিশ, যুক্তিযুক্ত আদেশ, ২৪ ধারার অধীনে দ্বি-স্তর আপিল— ভোটার-স্বার্থ রক্ষা করে সাংবিধানিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

Lal Babu Hussein (১৯৯৫) মামলার রায়কে আদালত যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছে। ওই রায় ছিল ব্যক্তি-ভোটারের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কে— সামগ্রিক সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে নয়। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ১১৪ ধারার (বর্তমানে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ২০২৩-এর ১১৯ ধারা) অধীনস্থ অনুমান খণ্ডনযোগ্য, অলঙ্ঘনীয় নয়। একবার লিপিবদ্ধ নাম চিরকালের জন্য অপরিবর্তনীয়— এমন ব্যবস্থা ভোটাধিকারকে রক্ষা করে না, পঙ্গু করে।

নাগরিকত্বের প্রশ্নে সর্বোচ্চ আদালত সমগ্র রায়ের সবচেয়ে সূক্ষ্ম রেখাটি টেনেছে। কমিশন তালিকা প্রস্তুতির সময় নাগরিকত্ব পরীক্ষা করতে পারে, কারণ জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৬ ধারা নাগরিকত্বকে তালিকাভুক্তির পূর্বশর্ত করেছে— তবে শুধুমাত্র ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি বা বহিষ্কারের সীমিত উদ্দেশ্যে। এই তদন্ত 'নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫'-এর অর্থে চূড়ান্ত নির্ধারণ নয় এবং কাউকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে কমিশনকে মামলাটি যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবে যা ঘটছে সেটিই সম্ভবত এই রায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। দশকের পর দশক ভারতের ভোটার তালিকা ছিল অশুদ্ধ। মৃতদের নাম থেকেছে, অভিবাসীদের নাম একাধিকবার তালিকাভুক্ত হয়েছে। সবচেয়ে গুরুতরভাবে— বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে— অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা জাল নথি দিয়ে বছরের পর বছর ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছেন। এই অবক্ষয় আকস্মিক ছিল না— এটি ছিল কাঠামোগত।

এসআইআর-পরবর্তী তথ্যই এই বিষয়টি তুলে ধরে। বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়তেই সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর পরিসংখ্যান সীমান্তবর্তী জেলায় সৎ পর্যবেক্ষকদের দীর্ঘদিনের বক্তব্য নিশ্চিত করেছে। হাজার হাজার অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিক— যারা সীমান্ত পেরিয়ে ফিরে যেতে শুরু করেছে। শুধু উত্তর ২৪ পরগনার হাকিমপুর সীমান্ত চৌকিতেই নভেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে প্রায় ১,৬০০ জনের প্রত্যাবর্তন বিএসএফ নথিভুক্ত করেছে। ২০ মে, ২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকার, বিএসএফ ও বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের সঙ্গে সমন্বয়ে 'Detect, Delete, Deport' প্রক্রিয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এসআইআর-এর মাধ্যমে ঠিক কাজই হয়েছে। একটি গুলিও না ছুঁড়ে, মধ্যরাতে করাঘাত ছাড়াই, শুধুমাত্র সঠিক ভোটার তালিকায় শৃঙ্খলায়— যাদের থাকার অধিকার ছিল না, তারা স্বেচ্ছায় চলে যেতে শুরু করেছে। ভোটাধিকারের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনার এর চেয়ে শান্তিপূর্ণ, আইনানুগ ও সাংবিধানিক কোনো পদ্ধতি নেই।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এমন এক রায় লিখেছেন যা বছরের পর বছর উদ্ধৃত হবে। এটি ধৈর্যশীল, যেখানে ধৈর্য প্রয়োজন ছিল, দৃঢ় যেখানে দৃঢ়তা প্রয়োজন ছিল এবং সাংবিধানিক মূলনীতিতে অবিচল। এসআইআর এক আশীর্বাদ হিসেবে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় থাকবে— সাম্প্রতিক প্রশাসনিক সংস্কারগুলির মধ্যে যা তার লক্ষ্যেই পৌঁছেছে। সর্বোচ্চ আদালতের রায় এখন সেই আশীর্বাদের সাংবিধানিক সিলমোহর দিয়েছে। সেটি কম কথা নয়।

এখনো কানে বাজে অভিষেক ব্যানার্জির সেই দাম্ভিক ভাষণ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে বাঙ্গালির ভদ্রতা শেখাতে চেয়েছেন। পারেননি তার ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জিকে তা শেখাতে। 'আপনি আচরি ধর্ম' এই কথা শুনে বড়ো হয়েছি। ইংরেজি ভাষায় পড়েছি, 'Charity begins at home'। এই দুই কথা অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন। তাই আজ তাকে জানাতে চাই, এই বাঙ্গালি কোনোদিন দাম্ভিকতা বরদাস্ত করেনি। সময় থাকতে যে বা যারা নিজেদের সংযত করেনি, এই মাটি তাদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। তৃণমূল তার ব্যতিক্রম নয়।

দেশের লোকপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে 'তুই-তোকারি' শব্দ-সহ অসম্মান করতে একটুও জিভে আটকায়নি। বাকি শব্দ-সহ বাক্যগুলো এখানে উল্লেখ করার আবশ্যকতা নেই বলেই তা উল্লেখ করছি না। আমরা সমাজে ভালো ও মন্দ নিয়ে বাড়ির ছোটোদের শিক্ষা দিই। সেই জন্যই ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের মতো হিন্দু হতে আর এপিজে আবদুল কালামের মতো মুসলমান হতে।' মানুষের কাছে এর থেকে আর কোনো ভালো উদাহরণ আছে বলে আমার মনে হয় না। ঠিক তেমনি আমরা যারা রাজনীতি করি তারাও যেন মনে রাখি, যা করছি তা যেন মানুষের কল্যাণের জন্য হয়। সেটা হলেই দেশের মঙ্গল হবে। আমাদের কাছে যেমন দেশ বড়ো, ঠিক তেমনি মানুষকে বাদ দিয়ে অবশ্যই দেশ নয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'মানুষ' আর দেশের মানুষের মধ্যে কতখানি তফাত আছে তা ভুলে ছিলেন। তাই তিনি অবৈধভাবে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে বেশি মাতামাতি করেছেন। তারা দেশের মানুষের অন্ন ও কর্মসংস্থানেও ভাগ বসিয়েছে। সরকারি সুযোগ সুবিধায় ভাগ বসিয়েছে। এদের উসকানি দিয়ে ট্রেন জ্বালিয়েছেন। মানুষের অসুবিধা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাতীয় সড়ক অবরোধ করিয়েছেন। পুলিশ সেদিন ছিল নীরব দর্শক। এদের বলে বলীয়ান হয়ে বলতে পেরেছেন, 'এসআইআর হলে তিনি দেশকে হেলিয়ে দেবেন।'

মনে রাখতে হবে, যারা ধান্দা নিয়ে আসে তাদের দিয়ে অন্যায় কাজ করিয়ে নেওয়া খুব সহজ। এরা দলভারী করে। এদের নিয়ে আমরা কেউ যদি ভাবি আমার হাতে এতো ছেলে আছে আর দর্প করি তা ভীষণ ভুল হবে। আমরা আমাদের যে শক্তি নিয়ে ও মানুষের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে রাজ্যে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি তা যথেষ্ট। এই মানুষের কথা শোনা আমাদের আবশ্যিক কর্তব্য। মানুষের সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনতে হবে। এটাই আমাদের ভদ্রতা। এটাই বাঙ্গালির ভদ্রতা। যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুলে ছিলেন, আজ তিনি তার ফল ভোগ করছেন।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

রাজনৈতিক আদর্শ নাকি সুবিধাবাদ?

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত কয়েকজন বিধায়ক ও নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদানের জন্য তৎপরতা চালাচ্ছেন। যদিও এই বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সামনে আসেনি, তবুও বিষয়টি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

সাধারণ মানুষের একাংশের বক্তব্য, যাঁরা দীর্ঘদিন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতি করেছেন, দলের নীতি ও নেতৃত্বের পক্ষে সরব থেকেছেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ শানিয়েছে, তাঁরা যদি আজ রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি দলে আশ্রয় খোঁজেন, তাহলে তা আদর্শগত পরিবর্তনের চেয়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ হিসেবেই বেশি প্রতীয়মান হবে।

বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে আসছে এক প্রাক্তন শ্রমিক নেতার নাম, যিনি একসময় প্রকাশ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-কে 'প্রকৃত বামপন্থী' বলে উল্লেখ করেছিলেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এমন ব্যক্তিরাই যদি আজ রাষ্ট্রবাদী রাজনীতির প্রবক্তা হয়ে ওঠেন, তাহলে তা অনেকের কাছেই 'দাঁড়কাকের ময়ূর সাজার' রাজনৈতিক উপাখ্যানের বাস্তব উদাহরণ বলে মনে হতে পারে।

অন্যদিকে, বনগাঁর রাজনৈতিক পরিসরে অতীতের একাধিক বিতর্কিত ঘটনার প্রসঙ্গও নতুন করে সামনে আসছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের অভিযোগ, ২০১৯ সালে বনগাঁ আরএস মাঠে অনুষ্ঠিত যোগী আদিত্যনাথের সভায় মাইকের তার কেটে দেওয়ার ঘটনায় এক তৃণমূল নেতার নাম উঠে এসেছিল। একইভাবে বনগাঁ হাসপাতাল-কালীবাড়ি এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা ও রক্তাক্ত করার ঘটনায়ও এক তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল বলে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা রয়েছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত ও সরকারি নথির ভিত্তিতে তথ্য যাচাই হওয়া প্রয়োজন।

এখন রাজনৈতিক মহলের আলোচনায় উঠে আসছে যে, সেই তৃণমূল কাউন্সিলর বর্তমানে বনগাঁ মহকুমার এক প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধির রাজনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন এবং ক্রমশ তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে বহু মানুষের দাবি, অতীতের বিতর্কিত ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের পাশাপাশি দায়বদ্ধতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ফঃ ৩

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দলবদল গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু অতীতের রাজনৈতিক ভূমিকা, বক্তব্য ও বিতর্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় গ্রহণ করলে জনমনে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। ভোটাররা কেবল বর্তমান অবস্থান নয়, অতীতের কর্মকাণ্ডকেও গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেন।

ফলে এখন প্রশ্ন উঠছে, রাজনীতিতে কি শুধুমাত্র দলীয় পতাকার পরিবর্তনই যথেষ্ট, নাকি অতীতের কর্মকাণ্ডেরও মূল্যায়ন হওয়া উচিত? বনগাঁ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রশ্নই আজ ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে বাড়ছে অতীতের বিতর্কিত ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার দাবিও।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
কলেজ রোড, খয়রামারী বনগাঁ,
উ: ২৪ পরগনা।

প্রকৃতি ও পাখির নিবিড় সম্পর্ক

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে পাখির কলতান শুরু হয়ে যায়। পাখিরা বুঝতে পারে রাত প্রায় শেষ হয়ে গেছে, ঊষার আগমন হতে আর বেশি দেরি নেই। প্রকৃতির মধ্যে যেকোনো ভালো ও খারাপের আভাস পাখি অনেক আগেই আমাদের জানিয়ে দেয়। যেমন দেখা যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আগে পাখিদের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতা আমরা কুকুরের মধ্যেও দেখতে পাই। কারণ এরা ভূমির সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে, পাখিরা সেই ঝড়ের পূর্বাভাস পায় অনেক আগে থেকে। আকাশ কালো করে ঝড় ওঠার আগে তারা বাসায় ফেরার চেষ্টা করে। ছানা, ডিম আগলে তাদের ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। শুধু বক নয় কাক, চিল, শঙ্খচিল, পায়রা, চড়াই, ঘুঘু, ছাতারে, বুলবুলি, টুনটুনি, বাবুই— এই সবই গ্রাম বাঙ্গলার পাখি। কবি ও সাহিত্যিকরা পাখি ও প্রকৃতির এই নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের বহু কবির রচনায় আমরা পাখি প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের কথা জানাতে পারি। এই সকল কবিদের নানা লেখা গদ্যে পদ্যে বারবার এই বিষয় ফিরে ফিরে এসেছে। বিশেষ করে বক বা বলাকার কথা তো হামেশাই সাহিত্যে উল্লেখ পাই। বক সাদা রঙের পাখি। ভোর হতেই বাসা ছেড়ে উড়ে যায় আহারের সন্ধানে। জলা জমি ঝিল খাল বিলের ধারে বক দেখা যায়। জল থেকে ছোটো ছোটো মাছ ধরে খায় ওরা। প্রকৃতির কোলে নিবিড়ভাবে এরা বেঁচে রয়েছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছু আগে পাখির দল ফিরতে শুরু করে। এরা বুঝতে পারে যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে আর বেশি সময় বাকি নেই। আবার রাত বাড়লে ডানা মেলে প্যাঁচা, বাদুড়ের মতো নিশাচরেরা বেরিয়ে পড়ে। বর্তমানে এই সকল পাখিদের বড্ড অভাব। মানুষের সীমাহীন লোভ এ সকল পাখিকে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আজকে বহু পাখি বিলুপ্তির পথে, প্রকৃতিকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে যাদের নিবিড় সম্পর্ক এই সকল পাখিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা খুবই প্রয়োজন।

—**তন্ময় পণ্ডিত,**
কাঞ্চনতার, মালদহ।

রাজনৈতিক পালাবদল পশ্চিমবঙ্গে

অঙ্গ, কলিঙ্গের পর বঙ্গ জয়। এবার সেই জয় এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। অন্যায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের রায়ের মধ্য দিয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর ফলে আগামী দিনে রাজ্যে সুশাসন ও বাঙ্গালির জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা পাবে। মূলত সাংস্কৃতিক জাতীয়তা, অখণ্ড মানবতা এবং আইনের শাসন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এক সর্বজনীন উন্নয়ন করাই নতুন সরকারের প্রধান কর্তব্য হবে তা বলাই বাহুল্য। এরাজ্যে সরকার পরিবর্তন দেশের সংস্কৃতির প্রতি আস্থার প্রতীক। এরাজ্যের মানুষ এসআইআর বিরোধিতা, আরজি কর ঘটনা, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, সিন্ডিকেটরাজ ও মাত্রাতিরিক্ত মুসলমান তোষণকে মোটেই ভালো চোখে দেখেনি। এছাড়া বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূলি নেতাদের তীব্র কুরুচিকর মন্তব্যের ফলে সাধারণ মানুষ তাদের উৎখাত করে পশ্চিমবঙ্গে এনে দিয়েছে নতুন ভোর। গণতন্ত্রকে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত। যার মূল লক্ষ্য হলো 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস'। এই জাতীয়তাবাদী সরকারের মূল উদ্দেশ্য হবে তোষণমুক্ত রাজনীতি এবং জাতীয় নিরাপত্তার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের জীবনমান উন্নয়ন ও দেশের সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা।

ইতিমধ্যেই নতুন জাতীয়তাবাদী সরকার রাজ্যে স্বচ্ছ প্রশাসন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সিন্ডিকেট সংস্কৃতি দূর করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করেছে। তবে এরাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা নিশ্চিতভাবে প্রশংসনীয় যথার্থ সিদ্ধান্ত তা বলা যেতেই পারে। সীমান্ত সুরক্ষার সঙ্গে রাজ্যে নারী নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্যই রাজ্যে সুশাসনের অন্যতম লক্ষণ। তবে বৈচিত্র্যময় পশ্চিমবঙ্গে বিভাজনমূলক রাজনীতিকে পরিহার করে সকলের নিরাপত্তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করা দরকার। সুশাসন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং দুর্নীতিমুক্ত ও কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সচেতন নাগরিক সমাজের ভূমিকাও অপরিসীম। ভুললে চলবে না যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করায় মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসে মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর বর্তমান জাতীয়তাবাদী সরকার। বর্তমানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে অপশাসনের অবসান হয়েছে। তাই রাজ্যে সুশাসনের অপেক্ষায় রাজ্যবাসী।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলী।

মা ও সন্তানের দূরত্ব কাম্য নয়

মিতা রায়

একটি শিশু মায়ের কোলেই বেড়ে ওঠে। মায়ের গায়ের গন্ধ স্পর্শ তাকে ভরসা দেয়, তিলে তিলে বড়ো করে তুলতে সাহায্য করে। মা-ও তাঁর আঁচলের তলায় আঁকড়ে ধরেন; তার শরীরে কোনো আঁচড় লাগতে না পারে, সেদিকে থাকে মায়ের স্নেহভরা দৃষ্টি। ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠা শিশুটির মনের বিকাশ ঘটতে থাকে। চোখ খুলে পৃথিবীটা চিনতে শেখে। মায়ের কোল ছেড়ে তখন সে মাটিতে পা রেখে আরও পাঁচজনের কাছাকাছি যেতে পারে। মনের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটতে থাকে। মা-ও তার বেড়ে ওঠা সন্তানকে তাঁর মনের মতো করে বড়ো করে তুলতে চান। নিজে হাতে সন্তানকে সবকিছু করে দিতে চান মা। তার কষ্ট, তার পরিশ্রম মা সহ্য করতে পারেন না। সন্তানের দেহে কোথাও লাগলে মা'র বুকেও যে ব্যথা লাগে। এই স্তরে এসে সন্তানের আবদার থাকে মায়ের কাছে তাকে খেলতে যেতে দেবার, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়ার, টিভি দেখতে দেওয়ার।

আবার অন্যদিকে মা চান না সন্তানকে কোথাও যেতে দিতে, যদি পড়ে যায়, যদি কেউ গায়ে ধুলো দেয়। অন্য বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে দিতে চান না, যদি তারা মা'র পছন্দের না হয়। টিভি দেখতে দেবেন না, কারণ পড়াশোনা করতে হবে বলে। এই শিশুর সব আবদারেই মায়ের 'না'— ধীরে ধীরে সন্তানকে স্বাভাবিকের পরিবর্তে অস্বাভাবিকতার পথে ঠেলে দেয়। সন্তান-মার ঘনিষ্ঠ আত্মিক সম্পর্কে চিড় ধরে। সন্তান মাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। মা মনে করেন, তাঁর সন্তান তাঁর অমতে কাজ করছে। এখানেই ধীরে ধীরে মা-সন্তানের মধ্যে 'সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম' শুরু হয়। অতি সচেতন মায়েদের সন্তানেরা আর পাঁচজন ছেলে-মেয়ের মতো সহজ স্বাভাবিক হতে পারে না। তার চাহিদার বিরুদ্ধে সর্বদাই মায়ের চাপিয়ে দেওয়া ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে তার ভালো লাগে না। তখনই সে হাঁপিয়ে ওঠে। ফলে কিছুটা বড়ো হলেই পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। পড়াশোনার সন্তানের 'দ্য বেস্ট' হওয়ার আশা থাকে মায়ের। কিন্তু তা পূরণ করতে না পারলে সন্তানের মধ্যে পলায়নপর মনোবৃত্তি কাজ করে। এমনকী সুন্দর পৃথিবীর রং-রস উপলব্ধি করার আগেই নিজেকে শেষ করে দেয়।

এহেন পরিস্থিতিতে সন্তান কৃতী, প্রতিষ্ঠিত হলেও বিবাহিত জীবনে সহজ হতে পারে না, কারণ মা তাকে সারাজীবন পরিচালিত করে চলেছেন। ফলে যে বসন্ত জীবনে আনে মধুর আনন্দ, তা নিরানন্দে পরিণত হয়। স্ত্রীর কাছে সে সহজ হয় না। সুতরাং, মা সন্তানের মনের কথা শুনুন, বন্ধুর মতো মিশুন। তবেই তো সন্তান সহজ হতে পারবে। সে যা চায়, তার মনের ইচ্ছাকেও গুরুত্ব দিন পেছনে থেকে, তাকে উৎসাহিত করুন। মার কাছেই সন্তান সহজ হয়, ভরসা পায় এবং তাঁর সাহচর্য সাহসে ভর করে জীবনের পথে এগিয়ে চলে। আমাদের দেশের মহীয়সী নারীরাই আদর্শ মা হতে পেরেছেন, তাঁদের নৈতিক শিক্ষায় সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে দেশের-দশের বীর সাহসী আদর্শ সন্তান করে তুলেছেন। সেইসব কৃতী সন্তানদের জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল মাতৃভক্তি। অথচ সেইসব মায়েরা ছিলেন অন্দরমহলের বাসিন্দা, কখনো-বা প্রথাগত শিক্ষা শূন্য।

অর্থাৎ বাস্তবে আজকের মায়েরা অনেক বেশি শিক্ষিত। সন্তানও একটি বা দুটি। সুতরাং তাঁদের শিক্ষার প্রভাব সন্তানের ওপর অনেক বেশি আলোকপাত করবে, এটাই আশা করা যায়। কিন্তু ঘটছে তার উলটো। মা-সন্তানের মধ্যে দূরত্ব ঘটছে। বড়ো হয়ে মায়ের থেকে সন্তানেরা দূরে চলে যাচ্ছে। মাতৃভক্তির টান আর সেভাবে দেখা যায় না। সুতরাং এই পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে মা-সন্তানের সম্পর্ক বোঝাপড়া হোক, বন্ধুত্বপূর্ণ হোক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের মোড়কে আবদ্ধ হোক। □

স্মৃতিভ্রম জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

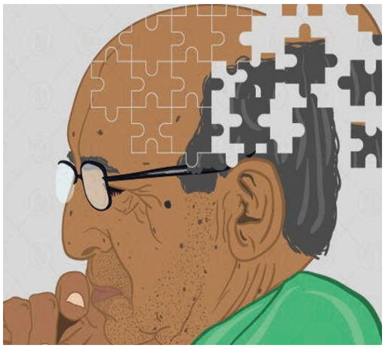

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো মানুষের জীবনে এমনই একটা ভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে যখন নিজেকে চিনতে ও বুঝতেও যেন তাঁর ভুল হয়ে যায় এবং তারই ফলস্বরূপ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তাঁর জীবনটাও। আপাতদৃষ্টিতে সেই রোগটাকে অতি নীরব বলে মনে হলেও আদতে তা কিন্তু নয়। ক্ষেত্রবিশেষে মারাত্মক রূপও ধারণ করতে পারে সে। আর শতাধিক বছরের পুরাতন এই ব্যাধির এখনো পর্যন্ত সঙ্গত কোনো কারণ খুঁজেও পাওয়া যায়নি।

চিকিৎসক অ্যালয় অ্যালঝাইমার্স এই রোগটিকে 'ক্রনিক নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিজিজ' হিসাবে চিহ্নিত করেন। মানুষের মস্তিষ্ককেই এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনাও করেছিলেন তিনি। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের গড় ওজন মোটামুটিভাবে এক কিলোগ্রাম তিনশো গ্রামের মধ্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কারণে যদি কমে যায় সেই পরিমাণ তাহলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যে প্রবল সেটা তাঁর গবেষণারই ফলাফল হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

একজন সুস্থ মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে গড়পড়তা এক হাজার কোটি স্নায়ুকোষ থাকে। নানা কারণে তারা আবার ক্ষয়প্রাপ্তও হয়। পরে নতুন করে বৃদ্ধিও পায় স্নায়ুকোষ এবং তার নেটওয়ার্ক। সেই ভাবে চক্রাকারেই চলতে থাকে এই প্রক্রিয়া। কিন্তু মস্তিষ্কে অপর আর এক স্নায়ুকোষ, যেটা পরিচিত পূর্ণাঙ্গ স্নায়ুকোষ নামে, তা বিগড়ালেই দেখা দেয় সমস্যা। তখন সৃষ্টি হয় স্মৃতিভ্রম নামক অতি অপ্রত্যাশিত সেই রোগের।

ডাঃ অ্যালঝাইমার্সের গবেষণার ফলাফল হিসেবেই যেহেতু আবিষ্কৃত হয়েছে সেই রোগ। সেইহেতু তার নামকরণও করা হয়েছে তাঁরই নামে। অর্থাৎ অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ নামে।

প্রাথমিক পর্বে সেটা আবার কেউ অনুভব করতেও পারেন না। একটু একটু করে তাঁরা ভুলতে থাকেন অতীত দিনের যাবতীয় স্মৃতিকথা ও স্মৃতিচিহ্নও। নানা ধরনের দুশ্চিন্তায় কাটে রোগাক্রান্তদের দিনরাত্রি।

আর অবশেষে এমনই একটা পরিস্থিতি আসে যে তখন সেই সমস্যা থেকে সহসা মেলে না মুক্তির পথও।

তারপর সেই ভাবেই কেটে যায় অনেকগুলো বছরও। আর ক্রমাগতভাবেই বাড়তে থাকে জটিল ও কঠিন সেই রোগের গতিপ্রকৃতিও। সেই সময় রোগী নিজে না হলেও তাঁর আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে অনেকেই কিছুটা সচেতনও হয়ে ওঠেন। শুরু হয় চিকিৎসাও।

রোগীর মনটা তখন নানাভাবে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্তি তখন তাঁকে অক্টোপাসের মতো এমনি ভাবে বন্দি করে ফেলে যে কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক, সেটা বোঝার ক্ষমতাটুকু হারিয়ে ফেলেন তিনি। তখন তাঁর মনে হয় তাঁর ঘনিষ্ঠজনরাই প্রতারণা করছে তাঁর সঙ্গে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, গয়না গাটি, টাকা-পয়সা ইত্যাদি গ্রাস করারই চেষ্টা করছে তারা। শুধু তাই নয়, ছিনিমিনি খেলছে তাঁর নিজস্ব মানসম্মান নিয়েও। আর তারই ফলস্বরূপ সংসারের মধ্যে শুরু হয় নানান ধরনের অশান্তি। আর তারই পরিণতি স্বরূপ সেই মুহূর্তে রোগের প্রকোপটাও যেন অনেক গুণ বেড়ে যায়।

সেই সময় দুর্ভাগ্যজনক অনেক ঘটনাই ঘটে যেতে পারে। তবে সবচেয়ে হতাশাজনক ঘটনা হলো এই যে, আক্রান্ত মানুষটি দীর্ঘদিন ধরে সেই অবস্থায় থাকতে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকে চরমভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বলা যেতে পারে তিনি মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েন।

একসময় হারিয়ে যায় তাঁর হেঁটে চলার ক্ষমতাও। আর সেই ভাবে বেশি কিছুদিন কাটার পর তাঁর দেখভালেরই দায়িত্বে থাকা লোকেদের কাছেও তিনি সন্দেহভাজন হয়ে ওঠেন। আর তারপর উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটাও যেন ভীষণ বিষাদময়ও হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ আক্রান্ত মানুষটি একসময় প্রায় একাই হয়ে পড়েন। ইচ্ছে থাকলেও তখন তাঁকে কেউ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার প্রয়োজন বোধও করেন না। ফলে বিছানায় অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোনো উপায়ও থাকে না। তখন যেকোনো ধরনের খাবারের প্রতিও অনীহা জন্মায় তাঁর। ঘুমের কথা তো ভুলেই যান তিনি।

ফলে তারপর জটিল থেকে জটিলতরই হতে থাকে রোগের গতি প্রকৃতি। আর সেই ভাবে চলতে চলতেই একসময় এই পৃথিবী থেকে হারিয়েই যান তিনি।

এটাই হলো স্মৃতিভ্রম রোগে আক্রান্ত রোগীদের চরম পরিণতি। অবশ্য বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে উন্নত হয়েছে চিকিৎসার মানও। তাই এখন অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার কাজও। সুতরাং অনেকে ফিরে পাচ্ছেন নতুন জীবনও। তবে একটা কথা একশো শতাংশই সঠিক যে, একটু সতর্ক থাকলে এবং নিজস্ব চেতনাকে একটু জাগ্রত করলে সহজেই অনুভব করা যায় এই রোগের আগমন বার্তাও। আর একটা সম্ভব হলে অতি সহজে নেওয়া যায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। □

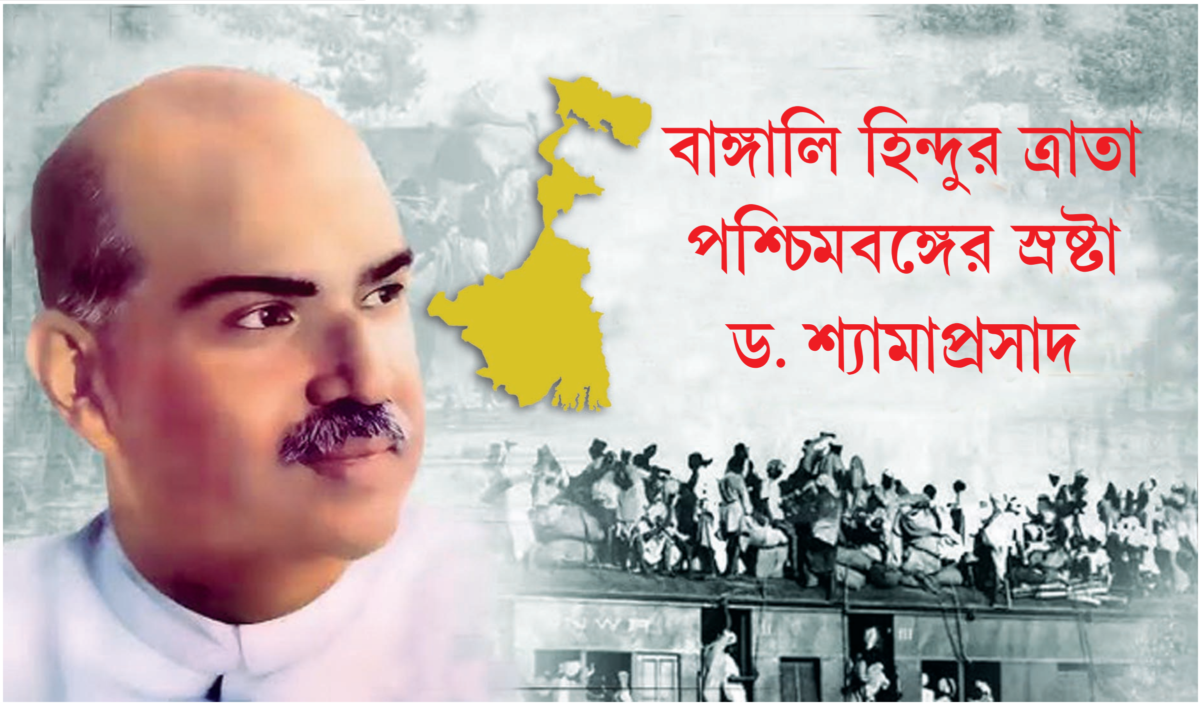

বাঙ্গালি হিন্দুর ত্রাতা পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

দিন যায়, দিন আসে। এটাই নিয়ম। কিন্তু মাসে মাসেই এই নিত্যকার আসা-যাওয়ার মধ্যে এক একটি দিন হীরক প্রভায় হয়ে ওঠে অতি উজ্জ্বল। ব্যক্তি ও জাতির জীবনে এমন দিন আসে কম। কিন্তু যখন আসে তখন যেন শুরু হয়ে যায় এক ধরনের আনন্দযজ্ঞ। যেখানে থাকে সকলের নিমন্ত্রণ। যে যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেয় সকলে— যুক্ত করে আপন হৃদয় পদ্মকে।

বঙ্গজীবনে এমনই একটি দিন ২০ জুন। ১৯৪৭ সাল। দেশ স্বাধীন হতে বাকি তখনও ৫৬ দিন। বঙ্গীয় আইনসভায় সেদিন দুই বঙ্গের সদস্যরা ভোট দিলেন বঙ্গ বিভাগের পক্ষে। তাঁরা চাইলেন পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ পৃথক অস্তিত্ব। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা যুক্তভাবে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করাতে পেরেছিল সেদিনের সভায়। প্রস্তাবের পক্ষে সেদিন ভোট দেন 'যুক্তবঙ্গ' নামক সোনার পাথরবাটির স্বপ্নে-বিভোর শরৎচন্দ্র বসুর দাদা সতীশচন্দ্র বসু এবং কিরণশঙ্কর রায়ও। ভোট দেন ওই আইন-সভায় ১৯৪৬-এর ভোটে নির্বাচিত তিন কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসু, রূপনারায়ণ রায় ও রতনলাল ব্রাহ্মণও।

জিন্না সেদিন বলেছিলেন, এতো 'পোকা কাটা' পাকিস্তান পেলাম। পূর্ব পঞ্জাব আর পশ্চিমবঙ্গকে দখলে রাখার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো তার।

জিন্নাকে এই আক্ষেপ করতে বাধ্য করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের অন্যতম ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। না চাইলেও একথা স্বীকারে বাধ্য হন ঐতিহাসিকরাও। তাঁদের বক্তব্য, "Shyamaprasad was successful in mobilizing the Hindu community for division; Sarat Bose and his allies could not resist the tide."

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের এই মূল্যায়নের মধ্যে অতিশয়োক্তি আছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ভারত-বিভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার প্রস্তাব যেদিন উঠেছিল প্রায় সেদিনই পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের ভাগ্য নিয়ে রাজনৈতিক নেতা এবং ইংরেজ শাসকের মধ্যে একরকম দড়ি টানাটানি শুরু হয়। ওই সময় মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে মুসলিম লিগ নেতা আলি জিন্নার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসি রাজনীতি তাঁকে করে তুলেছিল অত্যন্ত জেদি। পাকিস্তানের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে যে কোনোরকম আপোশ করবেন না তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন তিনি। কুটিল ইংরেজ শাসক তাকেই সমর্থন করেছিল সেদিন।

অন্যদিকে কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি অংশ যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীন ভারতের ক্ষমতায় বসার জন্য তখন লালায়িত। কিছুটা কৃতসংকল্পও। সে সময় জিন্না ও মুসলিম লিগের দাবি মতো পঞ্জাব ও বঙ্গদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তিতেও তারা তখন একরকম রাজি।

ওইরকম একটা অবস্থায় পঞ্জাবের নেতারা প্রায় এককাট্টা হয়েই পঞ্জাব বিভাজন চাইলেন এবং তাঁদের সেই দাবি মান্যতাও পেল। অন্যদিকে বঙ্গদেশের অবস্থাটা হলো একটু অন্যরকম। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের কংগ্রেসি রাজনীতিতে নেতৃত্বের জায়গাটা ধরে রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। নানা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং

সর্বভারতীয় কংগ্রেসের একটি অংশ এবং গান্ধীজীর সমর্থন না পাওয়ায় তাঁর কর্মসূচি নানা ভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। সে কারণে শেষপর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল কিছুটা বাধ্য হয়েই। তা সত্ত্বেও বঙ্গ রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব ছিল বহুদূর-বিস্তৃত।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর থেকেই বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতাদের বড়ো অংশ এক ধরনের ক্ষমতাপ্রিয়তার আসবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ব্যতিক্রম ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো হাতে গোনা কয়েকজন। ধর্মের ভিত্তিতে বঙ্গের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে তখন সমগ্র বঙ্গদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সক্রিয়। সেসময় হিন্দু নেতৃত্ব খণ্ডিত চিন্তায়, হয়তো-বা ক্ষমতার সুখ-ভোগের আশায় দোলাচলে। মুসলিম লিগের নেতাদের কাছে কেমন যেন অসহায়— ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়।

বঙ্গ রাজনীতির সেই কালবেলায় একাই রুখে দাঁড়ালেন শ্যামাপ্রসাদ।

মুসলিম লিগের নেতা এবং বঙ্গদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির নকুলদানা মার্কা কথায় বিশ্বাস করে শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়ের মতো বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা সেসময় ভারত-পাকিস্তানের বাইরে স্বাধীন বঙ্গভূমির এক অলীক স্বপ্নে বিভোর।

সেই স্বপ্ন-মাদকতায় শরৎ বসুরা যেন একচক্ষু হরিণ। বাস্তব তখন অবসৃত। স্বাধীন যুক্তবঙ্গে জনসংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে মুসলিম লিগই হবে সব ক্ষমতার অধিকারী। সেই অধিকারেই ভোল পালটে তারা যে পাকিস্তানে যোগ দিতে পারে এবং সেটা হলে হিন্দুদের যে করার কিছু থাকবে না— এটা তাঁদের চিন্তায় ঠাঁই করে নিতে পারল না। এমনকী এমন সম্ভাবনার প্রশ্নে সুরাবর্দি যে স্পষ্ট কিছু বলতে পারছেন না, এটাও নজরে পড়ল না তাঁদের।

ওই রকম একটা অবস্থায় গর্জে উঠলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— অসম্ভব। অবাস্তব পৃথক স্বাধীন বঙ্গের কল্পনা। তাঁর সাফকথা, স্বাধীনতার জন্য যদি ভারত ভাগ হতে পারে, ধর্মীয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে যদি পঞ্জাব বিভাজন সম্ভব হয় তাহলে বঙ্গদেশকে দু' টুকরো করা যাবে না কেন? তাঁর স্পষ্ট কথা, জাতীয় স্বার্থেই বঙ্গবিভাগই সব সমস্যা সমাধানের একমাত্র সরল সরণি। এই কথাটিই জোরগলায় বললেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কেবল বলা নয়, এই সহজ সত্যটি প্রচার এবং সকলকে বোঝাবার দায়িত্বও তুলে নিলেন তিনি প্রায় একাই তাঁর কাঁধে।

শারীরিক দিক থেকে শ্যামাপ্রসাদ তখন মোটেই সুস্থ নন। তাঁর বাহ্যিকরূপ দেখে শরীরের ভিতরের অবস্থা বোঝা তখন সকলের পক্ষে সহজ নয়। ডাক্তারদেরও রয়েছে নানা বাধানিষেধ। কিন্তু সবকিছু অগ্রাহ্য করে বঙ্গ এবং হিন্দু বাঙ্গালিদের স্বার্থে তিনি কার্যত একা কুম্ভ হয়ে শুরু করেন এক ক্লান্তিহীন সংগ্রাম।

সেই সংগ্রামের একটি মুহূর্তে তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন--- ''বঙ্গের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ বঙ্গ বিভাগ। এছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে আমার জানা নেই। ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই প্রদেশকে ভাগ করা হোক। দুই অংশে দুই ধর্মের জনগণ সুখে ও শান্তিতে বাস করুক এটাই আমি চাই।' (অমৃতবাজার পত্রিকা, রবিবার ৬ এপ্রিল ১৯৪৭, পৃ. ৩)

তারকেশ্বর হিন্দু মহাসভার ওই বিরাট সম্মেলনে বসে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ৪ এপ্রিল শুক্রবার থেকে তিনদিন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ওই আহ্বান জানান। পরের দিন অর্থাৎ ৬ এপ্রিল তারকেশ্বরের মাঠে এক বিরাট জনসভার ঘোষণা করা হয় বঙ্গ ভাগ সম্পর্কে সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তটি। ওই দিনই সম্মেলনে মূল প্রস্তাবটি তোলেন সনৎকুমার রায়চৌধুরী এবং তা সমর্থন করেন ঢাকার সূর্য কুমার বসু।

তারকেশ্বরে ৬ এপ্রিল হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। আর ৪ এপ্রিল কলকাতায় বসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতির বৈঠক। সে বৈঠকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী, বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ, মাখনলাল সেন এবং অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সেদিন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ঐক্যবদ্ধ ভাবেই বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। আর এর ফলে সারা বঙ্গে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা একই সঙ্গে শুরু করে প্রচার অভিযান এবং জনমত গঠনের কাজ।

২২ এপ্রিল দিল্লিতে একসভায় ড. শ্যামাপ্রসাদ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ''পাকিস্তান যদি নাও হয়, মুসলিম লিগ যদি মন্ত্রী মিশন পরিকল্পিত দুর্বল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা মেনেও নেয়, তাহলেও হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে। এটা আমাদের দাবি।''

তৎকালীন সাম্প্রদায়িক হানাহানি, সন্ত্রাস ও অস্থিরতার অবসানের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে পৃথক বঙ্গভূমি বা পশ্চিমবঙ্গের দাবি জানায় তা সেই মুহূর্তের অতি সঙ্গত এবং সুচিন্তিত সমাধান বলেই ঐতিহাসিকরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

হিন্দুদের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ বা রাজ্যর এই দাবি হঠাৎ করে ওঠেনি, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ধীরে ধীরে হিন্দুদের জন্য পৃথক ভূমির চিন্তাভাবনা দানা বাঁধছিল। সম্ভবত সিমলা থেকে প্রকাশিত 'রয়েস উইকলি' প্রথম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের দাওয়াই হিসেবে বঙ্গবিভাগের কথা বলে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দেই দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় অধ্যাপক হেমন্ত কুমার সরকার স্বতন্ত্র বঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের সমর্থনে ধারাবাহিক ভাবে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন।

ওদিকে অমৃতবাজার পত্রিকা এমনকী

স্টেটসম্যানও তাদের কাগজে দেশভাগের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন লেখক ও পাঠকের রচনা প্রকাশ করতে থাকল। আর 'পাকিস্তান' যখন প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল সে সময়েই হিন্দু মহাসভা বঙ্গবিভাজনের দাবি তুলল।

সেই সময় হিন্দু মহাসভার নেতা হিসেবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, "...if Bengal, 'as it was constituted and administrated today' was allowed to become a separate independent state cut off from the rest of India, the Hindus would resist it with thetr lives. He demanded partition of Bengal whether Pakistan comes of not." (The last phase of the Transfer of Power) (Vijai Shankar Rai)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভাতেও পৃথক পশ্চিমবঙ্গের দাবি জানানো হয়।

বস্তুত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ বিভাজনের কথা জোর গলায় তোলার পর থেকে তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসে পত্রপত্রিকাগুলি। গর্জে উঠতে থাকে জনমত। অবশ্য সে সময়ও বঙ্গের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবীও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় নামেন। অবশ্য সেসব উপেক্ষা করতেই হয়। কেননা, বাঙ্গালি চিরকালই নীরদ সি চৌধুরীর ভাষায় 'আত্মঘাতী'। কথায় বলে, 'আপন ভালো পাগলেও বোঝে'। সেই কারণেই বোধহয় একশ্রেণীর বাঙ্গালি 'আপন ভালো'র জন্য 'দেশের ভালো'-কে বলি দিতে ইতস্তত করেন না।

তবে সত্য এটা, কেবল দৈনিক নয়, সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলিও বঙ্গভাগের প্রশ্নে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেই সমর্থন জানাতে থাকে। সম্পাদক সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস লেখেন, "গান্ধীজী গ্রুপ ভাঙ্গিয়া আসামকে স্বাধীন হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। মাইনরিটি মুসলমান, ভারতে সেফগার্ড খুঁজিতেছে, সে যুক্তিতে বঙ্গের হিন্দুর সেফগার্ডের দাবি। সম্প্রতি বঙ্গের কয়েকজন নেতা, পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী— কারণ বঙ্গের লিগ সংখ্যাধিক শাসনাধীনে, বাঙ্গালি হিন্দুর ধন, প্রাণ, স্বার্থ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নারীর মর্যাদা বিপর্যস্ত। সম্মেলন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ গঠনের দাবি জানাইতেছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মেজর জেনারেল এসি চ্যাটার্জি, ড. প্রমথ বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ ব্যক্তি এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।" (শনিবারের চিঠি, পৌষ, ১৩৫৩)।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তী ১৯৫৩-র ২৪ জুন হাইকোর্টের স্মরণসভায় বলেছিলেন, বঙ্গদেশকে কার্যত বলি দিয়ে যে সময় স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা চলছিল, সে সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রুখে না দাঁড়ালে আজ কলকাতা হাইকোর্ট আর এই ভারতভূমির অঙ্গ থাকত না।

হিন্দু বাঙ্গালির জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের এই যে দাবি তার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক ড. অমলেন্দু দে লিখেছেন, "১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েই এই দাবি উপস্থাপিত হয়। মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য হিন্দু মহাসভা বঙ্গভঙ্গের দাবি করে। এই সময় থেকেই হিন্দু মহাসভা হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে এই দাবির সমর্থনে প্রচার শুরু করে। কয়েকজন অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীও এই প্রচার অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।" (স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনার প্রয়াস ও পরিণতি, পৃ. ৩)

প্রায় প্রথম থেকেই বঙ্গবিভাগের বিরোধী ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। নানা ভাবে তিনি এর বিরোধিতা করেছেন। একাজে তিনি মুসলমান নেতা সুরাবর্দির সঙ্গে জোট বেঁধেছেন। নতুন ধুয়া তুলেছেন, বঙ্গ বিভাজন নয়, নতুন স্বাধীন দেশ হোক। বলেছেন, বঙ্গের বেশিরভাগ হিন্দু বিভাজন চান না, চান স্বাধীন যুক্তবঙ্গ। বলেন, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জনমতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণেই তিনি জানেন, বঙ্গের সব হিন্দু বঙ্গভাগ চান না। পূর্ববঙ্গের সব হিন্দুও বঙ্গবিভাগের বিরোধী।

শরৎ বসু প্রকৃত ব্যাপারটা হয়তো জানতেনই না, অথবা জেনেও বিভ্রান্তি ছড়াতেই ওইসব বিবৃতি দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা তো জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে বঙ্গ বিভাগে উদ্যোগী হতে অনুরোধ জানিয়েছেন। যদিও তাঁরা জানেন, তেমনটা হলে হয় তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে হবে অথবা পূর্ববঙ্গেই মুসলমানদের অধীনে থাকতে হবে।

অবশ্য এর বিপরীতে বলাই যায়,

পূর্ববঙ্গের মানুষ দাঙ্গাপীড়িত হওয়ার কারণেই সাম্প্রদায়িক হিংসা থেকে বাঁচার জন্য বঙ্গবিভাগ চাইছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও কেন দেশভাগের পক্ষে? উত্তরে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা একসঙ্গে বঙ্গবিভাগ চাওয়ার কারণে এবং কলকাতা নরসংহারের পর পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও আর মুসলমানদের বিশ্বাস করতে না পারার ফলেই বঙ্গবিভাগের দাবি উঠেছে। তবে এই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে মূলত মধ্যবর্তী শ্রেণীর কাছ থেকেই।

আর সেটাই তো ঘটে থাকে সব দেশে। মধ্যবর্তী শ্রেণী এগিয়ে এলেই পরে তা জনআন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তো সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। বঙ্গে সেই সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজটাই করেছেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি কেবল দাবি তুলে বা বক্তৃতা করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁর বক্তব্যকে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য দেশের নানা প্রান্তে সভা-সমিতি করেছেন, মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছেন, তাঁদের পথে নামতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যুক্তি দিয়ে সকলকে বুঝিয়েছেন প্রকৃত অবস্থাটা। এসবের জন্য ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশ করেছেন, সম্পাদনা করেছেন 'ন্যাশালিস্টস্' এবং 'হিন্দুস্থান' নামে দু'টি দৈনিক পত্রিকা।

ড. শ্যামাপ্রসাদের এইসব কর্মকাণ্ডের জন্যই বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বঙ্গবিভাগের প্রশ্নে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেবল নয়, যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বঙ্গবিভঙ্গের বিরোধী ছিলেন তাঁরাও ক্রমে তাঁরই মতানুসারী হন, তাঁরাও পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠার পক্ষেই রায় দেন।

বঙ্গ বিভাগ নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা সে সময় এক জনমত সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় দেখা যায় ৯৭ শতাংশ যা মানুষই বঙ্গবিভাগ চান। অমৃতবাজার পত্রিকা সেইসময় ওই সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে একাধিক রচনাও প্রকাশ করে।

ঐতিহাসিকরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন, নানা কারণে হিন্দু মহাসভা সেসময় কংগ্রেস বা মুসলিম লিগের তুলনায় অনেক হীনবল হয়েও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ ও কুশলী নেতৃত্বের কারণেই বঙ্গবিভাগের মতো অতি স্পর্শকাতর বিষয়ে দেশের হিন্দু জনগণকে এক বিন্দুতে মিলিত হতে একরকম বাধ্য করেছিলেন। তাঁর সেই প্রয়াস, সেই কঠোর সাধনা বা তপশ্চারণেরই ফলে আজ স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য।

অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়, 'গৌর না থাকিলে কী হইত?' একই ভাবে উচ্চারিত হতে পারে, 'ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকিলে কী হইত?' বস্তুত একজন মানুষ আপন ব্যক্তিত্ব, সততা, নিষ্ঠা ও নিরলস সাধনা এবং চরম আত্মদানের মধ্য দিয়ে একটি জাতিকে যে কোনো উচ্চতায় তুলতে পারেন তার নিদর্শন এই ভারত। তাঁর উদাহরণ ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণের পর কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তী ১৯৫৩-র ২৪ জুন হাইকোর্টের স্মরণসভায় বলেছিলেন, বঙ্গদেশকে কার্যত বলি দিয়ে যে সময় স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা চলছিল, সে সময় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রুখে না দাঁড়ালে আজ কলকাতা হাইকোর্ট আর এই ভারতভূমির অঙ্গ থাকত না।

শেষ করতে হয় কবি নজরুলের কথা দিয়ে। কবির ভবিষ্যৎবাণী ছিল, ''আমি জানি, আমরাই এক ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব। সেদিন বাঙ্গালির আপনাকে ও সুভাষবাবুকেই সকলের আগে মনে পড়বে। আপনারাই হবেন এদেশের সত্যিকার নায়ক।'' ■

দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপন অনুষ্ঠান

গত ১ জুন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ১৫ দিনব্যাপী সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো উলুবেড়িয়া স্টেডিয়ামে। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের সম্পাদক পূজ্য স্বামী নিত্যরূপানন্দ মহারাজ। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মমতাশঙ্কর। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর। এছাড়াও মঞ্চাসীন ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল এবং বর্গাধিকারী তথা মেদিনীপুর জেলা সঙ্ঘচালক আশিস কুমার পান। অনুষ্ঠানে ধ্বজোত্তোলনের পর শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকরা গত ১৫ দিনে যা

শিক্ষাগ্রহণ করেছেন তার কিছু নমুনা প্রদর্শন করেন। তারপর বর্গ কার্যবাহ মদন বিশ্বাস বর্গের প্রতিবেদন পাঠ করেন। তিনি জানান, এই বর্গ গত ১৭ মে শুরু হয় আজ তার সমাপন দিবস। বর্গে ১৭১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক ও কৃষক রয়েছেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী নিত্যরূপানন্দ মহারাজ বলেন, শরীর শক্ত হলে মন শক্ত হয়, মন শক্ত হলে পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মানুষ তৈরির কাজ করে চলেছে। বিশেষ অতিথি মমতাশঙ্কর বলেন, দেশের কাজ করার জন্য প্রত্যেকের সঙ্ঘের শিক্ষা গ্রহণ করা প্রায়োজন। সঙ্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মন তৈরি করে চলেছে। তিনি প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘের মতো প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সহসরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর বলেন, প্রথমদিকে সঙ্ঘের প্রতি উপেক্ষা (No RSS)-র মনোভাব ছিল, এখন সঙ্ঘকে জানার আগ্রহ (Know RSS) বেড়েছে। সমাজ সঙ্ঘকে গ্রহণ করেছে।

সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সঙ্ঘের কলকাতা দক্ষিণ বিভাগ প্রচারক তথা বর্গের বৌদ্ধিক প্রমুখ রবিকিঙ্কর ঘোষ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সব্যসাচী নস্কর। অনুষ্ঠানে পাঁচহাজার নাগরিক উপস্থিত ছিলেন।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সদস্যতা অভিযান

বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া তারাপুর লজে গত ৩০ মে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের (বিদ্যালয় শিক্ষা) সংগঠন পরিচিতি ও সদস্যতা অভিযান কর্মসূচি পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক তথা বিশিষ্ট শিক্ষক তরুণ কুমার লায়েক, এবিআরএসএমের প্রান্ত সহসম্পাদিকা নবনীতা কুণ্ডু-সহ জেলা

কার্যকর্তাগণ। ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ মহেন্দ্র নারায়ণ সিংহ। জেলার ৯৩ জন শিক্ষক সদস্য এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে সংগঠনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির পাশাপাশি সাংগঠনিক কার্যক্রম, সদস্যতা অভিযানের গুরুত্ব এবং শিক্ষক সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ফঃ ৪

কলকাতা বইপাড়ায় 'বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদ'-এর সাধারণ সভা

গত ১ জুন মধ্য কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার সংলগ্ন ত্রিপুরা হিতসাধনী সভাগৃহে (৩, সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯) আত্মপ্রকাশ করল 'বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদ'। গ্রন্থশিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রকাশক, মুদ্রক, পরিবেশক ও সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে নবগঠিত সংগঠনের এই সভাটি এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক মাইলফলকে পরিণত হয়। সভামঞ্চ আলোকিত করেন এদিনের সভার সভাপতি ও স্বস্তিকা (হিন্দি) মাসিক পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক ডাঃ আনন্দ পাণ্ডেয়, কাঞ্চী মঠের সন্ন্যাসী পূজনীয় বিশাখানন্দ তীর্থজী মহারাজ, ধর্ম জাগরণ সমন্বয় সমিতি (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সহ-সংযোজক রতন চক্রবর্তী, 'রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. রাকেশ দাশ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর বিশেষ সম্পর্ক প্রমুখ ও 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র প্রতিনিধি দীপক চৌধুরী এবং 'রাষ্ট্রীয় লেখক মঞ্চ'-এর রাজ্য সভাপতি ড. রতন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টজন। প্রথম সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল— (১) বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদের সাংগঠনিক কার্যক্রম। (২) প্রকাশক, মুদ্রক ও পুস্তকবিপণীগুলির স্বার্থসংরক্ষণ। (৩) বাংলা গ্রন্থশিল্পের বর্তমান সমস্যা ও সম্ভাবনা। (৪) সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। (৫) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়।

কলেজ স্ট্রিটের একাধিক সুপরিচিত প্রকাশনা সংস্থা, যেমন— জয়শ্রী প্রকাশন, পারুল প্রকাশন, বইবন্ধু প্রকাশন, বিভা প্রকাশনী, স্মেল অফ বুকস্, চর্যা প্রকাশনী, পত্র ভারতী, পত্রলেখা, একলব্য প্রকাশনী, চারুপত্র প্রকাশনী-সহ মোট ২৯টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এদিনের সভায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের সুপরিচিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'এখন ডুয়ার্স', দিল্লি থেকে আগত অথার প্রেস, নীল নারায়ণ, রুদ্র পাবলিশার্স ও অরেঞ্জ বুকস্-এর কর্ণধার ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতি এদিনের সভার গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। কলকাতার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলাজুড়ে কাজ করা— অক্ষরবিন্যাস প্রকাশনী, বার্নিক প্রকাশন, অজয় সাহিত্য পর্ষদ, ঋতভাষ প্রকাশন, অঙ্কুর প্রকাশন, মুখর প্রকাশনী প্রমুখেরা এদিনের সভায় তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৫৩ জন। সভায় 'বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে একটি প্রাথমিক সাংগঠনিক রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়। সেখানে জাতীয়তাবাদী ভাবনা ও 'রাষ্ট্র-সর্বোপরি' চেতনাকে পুরোভাগে রেখে কীভাবে বাংলা গ্রন্থশিল্পের বিকাশ ঘটানো যায় এবং প্রকাশক, মুদ্রক ও পুস্তক বিক্রেতাদের নানাবিধ সমস্যা সংগঠিতভাবে মোকাবিলা করা যায়— সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূজনীয় বিশাখানন্দ তীর্থজী মহারাজকে পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা, রতন চক্রবর্তীকে কার্যকরী সভাপতি, দেবজ্যোতি চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক এবং অরিন্দম নাথকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত করা হয়। এছাড়াও ড. রাকেশ দাশ, ড. রতন ঘোষ,অনির্বাণ দে, শ্রী দীপক চৌধুরী ও শিবশঙ্কর চক্রবর্তীকে পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। অন্যদিকে বলরাম বসু, ড. সৌমক পোদ্দার ও রত্নদীপ চট্টোপাধ্যায়কে সহ-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। আগামীদিনে পরিষদের কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পথপ্রদর্শক রূপে পত্রলেখা প্রকাশনীর কর্ণধার গুণেন শীলকে সংযুক্ত করা হয়। এই আপাত কার্যনির্বাহী সমিতি নির্মাণ হলেও অতি সত্ত্বর এই সমিতির কলেবর বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিকাধিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে। আলোচনা পর্বে আগামীদিনে রাষ্ট্রহিত ও সমাজকল্যাণের লক্ষ্যে গ্রন্থ উৎপাদন, প্রকাশনা ও বিপণন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সমন্বিত করার বিষয়ে এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন পরিষদের কার্যকরী সভাপতি রতন চক্রবর্তী, সাধারণ

সম্পাদক দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, বইবন্ধু প্রকাশনের কর্ণধার শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, স্মেল অফ বুকস্-এর কর্ণধার রত্নদীপ চট্টোপাধ্যায়, একলব্য প্রকাশনীর প্রতিনিধি সুশোভন প্রামাণিক এবং জয়শ্রী প্রকাশনের প্রতিনিধি রৌণক চক্রবর্তী। তাঁরা প্রকাশনা শিল্পের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং একটি ঐক্যবদ্ধ মঞ্চের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সবশেষে সভার সভাপতি ডাঃ আনন্দ পাণ্ডের সম্ভাষণ, সমবেত শপথ গ্রহণ এবং শান্তিমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত সদস্যদের মতে, 'বঙ্গীয় গ্রন্থশিল্প পরিষদ' ভবিষ্যতে বাংলা প্রকাশনা জগতের বিভিন্ন অংশীজনকে একটি অভিন্ন সাংগঠনিক ছাতার তলায় এনে গ্রন্থশিল্পের উন্নয়ন ও পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়।

ওড়িশার কালাহাণ্ডিতে সংস্কৃতভারতীর ক্ষেত্রীয় প্রশিক্ষণ শিবির

পশ্চিম ওড়িশার কালাহাণ্ডি জেলার কেশিঙ্গায় সরস্বতী শিশু বিদ্যামন্দিরে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে গত ১৮ থেকে ২৯ মে ক্ষেত্রীয় (পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা) সংস্কৃত প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গত ২৯ মে। এই শিবিরে সংস্কৃত ভাষার প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের মহাবিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং সংস্কৃত পিপাসু ব্যক্তিদের নিয়ে সংস্কৃতভাষায় কথা বলা, লেখা ও অনুধাবনের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং সংস্কৃত অধ্যাপনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রামঅবতার আগরওয়াল বলেন, সংস্কৃত কেবল পুস্তকের ভাষা নয়, এটি আমাদের জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সংস্কৃতভারতীর সারস্বত অতিথি পণ্ডিত মঙ্গলচরণ মিশ্র বলেন, সংস্কৃতভাষা জাতীয় ঐক্য, সাংস্কৃতিক গৌরব এবং ভাষাগত সমন্বয়কে সুদৃঢ় করে।

প্রধান বক্তা তথা সংস্কৃভারতীর সর্বভারতীয় বালকেন্দ্র প্রমুখ ড. বেঙ্কটরমণ মূর্তি বলেন, সহজ পদ্ধতিতে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দিয়ে সাধারণ মানুষকে সংস্কৃভাষার সঙ্গে যুক্ত করা এবং ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা, শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সংস্কৃতভারতীর পশ্চিম উৎকল প্রান্তের সভাপতি আয়ুষ্মন্ত পণ্ডা বলেন, সংস্কৃতভারতীর লক্ষ্য হলো সংস্কৃতভাষার পুনর্জাগরণ, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের পুনর্নির্মাণ। প্রান্ত সম্পাদক অজিত কুমার পণ্ডা বার্ষিক কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। প্রান্ত সহসম্পাদক ড. মানসরঞ্জন সাহু স্বাগত ভাষণ এবং অতিথিদের পরিচয় প্রদান করেন।

দক্ষিণবঙ্গের মহাবিদ্যালয় কার্য প্রমুখ অশোক মুখোপাধ্যায় সভা পরিচালনা করেন। প্রান্ত গণ-সদস্য সারদা সাগর মহান্তি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বৈদিক মঙ্গলাচরণ পরিবেশন করেন প্রান্ত প্রচার প্রমুখ শুভেন্দু মিশ্র ও শ্রেয়া মৈত্র। শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ শিবিরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

ক্ষেত্রীয় সংযোজক নৃসিংহপ্রসাদ পণ্ডা, ক্ষেত্রীয় সংগঠন মন্ত্রী প্রণব নন্দ, প্রশিক্ষণ প্রমুখ চন্দ্রকান্ত দেশমুখ, সহ-প্রশিক্ষণ প্রমুখ ড. মধুসূদন সাহু, গদাধর প্রধান, সুধাকর বেহেরা, সন্ধ্যারানি চৌধুরী, বিরজা প্রধান, হীরাকান্তি মাণ্ডি, সুরেশ সুনা, সুব্রত রাউত, রাজেশ্বরী রথ, বিভাগ সঙ্ঘচালক বিশ্বনাথ কামানি, ধর্মরাজ বাগ, সুরেশ্বরী ভোই, বীণাপাণি ধুরুয়া, উপেশ বারিক, ঈশ্বর গড়ুরিয়া প্রমুখ সদস্য প্রশিক্ষণ শিবির সফল করতে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন।

বিজয়গড়ে বাঘাযতীন ভাগের উদ্যোগে ‘হিন্দু মহাসম্মেলন’

গত ২৯ মে দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরে বিজয়গড়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঘাযতীন ভাগের আয়োজনে যুব সঙ্ঘ ময়দানে (বারো ভুত মেলার মাঠে) অনুষ্ঠিত হয়— ‘হিন্দু মহাসম্মেলন’। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, বাঘাযতীন ভাগের সঙ্ঘচালক শিবসদয় রায় এবং প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুভাষ আচার্য। প্রায় পাঁচ শতাধিক অতিথি অভ্যাগত-সহ স্বয়ংসেবকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মূলত অনুষ্ঠানটি হয় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের দিন অর্থাৎ ‘হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব’কে কেন্দ্র করে। স্বয়ংসেবকদের শারীরিক কার্যক্রমও প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন অদ্বৈতচরণ দত্ত। তিনি ‘হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব’-এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে বর্তমান সময়ের সুন্দর এই দিবস উদ্‌যাপনের প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন।

বিবেকানন্দ আইডিয়াল পাবলিক স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ২৪ মে হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া ব্লকের তড়া-আঁটপুরে বিবেকানন্দ আইডিয়াল পাবলিক স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্কুলের শিশু বিদ্যার্থী ও আচার্যাদের মিলিত কণ্ঠে ‘ধনধান্য পুষ্পভরা’ এবং ‘ভারত আমার ভারতবর্ষ’ গানদুটির পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক প্রসেনজিৎ বাগ এবং স্কুলের কর্ণধার অধ্যাপক রাসবিহারী ভড়। প্রথমেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করেন বিধায়ক প্রসেনজিৎ বাগ। এরপর শুরু হয় শিশু শিক্ষার্থীদের নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন। বিধায়ক প্রসেনজিৎ বাগ ছাত্র-ছাত্রীদের সস্নেহ উৎসাহ প্রদান করে তাঁর বক্তব্যে বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন। বিদ্যালয়ের

কর্ণধার প্রফেসর রাসবিহারী ভড় এবছর এলাকার মাধ্যমিক পরীক্ষায় স্থানাধিকারীদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদান করে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী, আয়ুর্বেদাচার্য ও লেখক ডাঃ আনন্দ পাণ্ডে। তিনি তাঁর বক্তব্যে সকলকে উৎসাহ প্রদান এবং বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করে বিদ্যালয়ের আচার্যাদের পুরস্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক এবং স্থানীয় মানুষের উপস্থিতি ভালো সংখ্যায় ছিল। অনুষ্ঠান সচারুভাবে সঞ্চালনা করেন স্থানীয় শিক্ষাবিদ শুকদেব দাস। সমবেত কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম্’ এবং ‘জনগণমন’ গানের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

অরণ্যষষ্ঠী—রূপে অরূপে

বেদে অরণ্য বা বৃক্ষ পেয়েছে একটি বিশেষ মর্যাদা। তাতে রয়েছে বনসংরক্ষণ এবং তার পূজার কথা। এই অরণ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সংস্কৃতি ও সাম্যের সৌগন্ধ। বেদের ওই ভাবনাই লোক জীবনে প্রতিভাত অরণ্য বা বৃক্ষমূলে ষষ্ঠীর আরাধনার মধ্যে। যতই লৌকিক বলা হোক, অরণ্যষষ্ঠীর পূজার মধ্যে বহমান কিন্তু সেই বৈদিক ধারাই।

পরিব্রাজক

হিন্দু মননের বিভা

এক থেকে দুই। আবার দুইয়ে মিলে এক। এমনটাই হয়। হয় এক পরমের ইচ্ছায়। এই পরম শক্তিই ব্রহ্ম। ভারতের বৈদান্তিক চেতনায় এটাই তত্ত্বসত্তম। এই সত্যই নানাভাবে নানারূপে বিভাসিত ভারতীয় জীবনচর্যায়। এটাই ভারত তথা হিন্দু মননের এক বিশেষ রূপ। এই রূপেই বিমোহিত সারা বিশ্ব।

বেদ, উপনিষদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যে ভারতীয় জীবনবোধ, তার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য— জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি কর্মে একজন হিন্দু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই ওই বৈদান্তিক চিন্তাধারারই প্রতিফলন ঘটায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দুর জীবনে এগুলি প্রতিভাত হয় জ্ঞানে অথবা অবচেতনে। না-জেনেও প্রতিটি হিন্দুই বেদ নির্দিষ্ট— বেদবর্ণিত বিধি ও নীতিগুলিকে অনুসরণ করে চলেছেন এবং সে কারণেই কোনো আনুষ্ঠানিক আচারের অনুবর্তী না হয়েও প্রতিটি হিন্দু স্বীকারে অথবা অস্বীকারেও একজন ধার্মিক।

সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতে হয়, হিন্দুর প্রতিটি পূজা, পার্বণ বা ব্রত তপস্যাই আবর্তিত ওই বেদবিধিকে কেন্দ্র করেই। হিন্দুর এই যে সব ধর্মাচরণ তাকে ভাগ করা হয় মূলত তিনটি শ্রেণীতে— আত্মজন্য, সমাজজন্য এবং সম্বন্ধজন্য। আত্মরক্ষা বা আত্মিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যেসব কর্ম করা হয় সেগুলিকে বলা হয় আত্মজন্য। এই ধরনের পূজা ব্রতর মধ্যে পড়ে কালীপূজা, শিবরাত্রি ইত্যাদি। সমাজ কল্যাণ বা সমাজের সকলকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান সেগুলি হলো সমাজজন্য। এর মধ্যে পড়ে দোল, দুর্গাপূজা ইত্যাদি। আর আত্মীয়-পরিজনের মঙ্গলের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মগুলিকে বলে সম্বন্ধজন্য। সাবিত্রী চতুর্দশী, অরণ্যষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠী ইত্যাদি এর উদাহরণ।

প্রকৃতি পূজারই নামান্তর

ওপরের ওই অভিধায় অরণ্যষষ্ঠী, যার ঘরোয়া নাম জামাইষষ্ঠী, সেটি হলো

পরিবার বা আত্মজনের সার্বিক কল্যাণ কামনার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। অরণ্য ও ষষ্ঠী— এই দু'টি পৃথক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি নতুন অর্থবহ শব্দ অরণ্যষষ্ঠী। এই শব্দবন্ধের মধ্যে রয়েছে ঔপনিষদিক চিন্তার প্রকাশ। অরণ্য শব্দটি বহুমাত্রিক। তপস্যার উদ্‌ভাস ও তপঃক্লেশ নিরসনের প্রকাশ এর মর্মবাণী। একই সঙ্গে এর মধ্যে আছে ত্যাগ ও ভোগের কথা। আছে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বার্তা।

বৈদিক মননে সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতি বা অরণ্যের রয়েছে একটি বিশেষ ভূমিকা। এর মধ্যে একই সঙ্গে রয়েছে প্রকৃতি তথা পরিবেশ সুরক্ষার ভাবনা এবং সেই সুরক্ষার জন্যই সেই প্রকৃতির পূজার কথা। সেই বৈদিক ভাবনার কথাচিত্র বিম্বিত রবীন্দ্ররচনায়। কবির কথায়, 'যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব ঘটেছে, সেখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন সেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে, সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে।'

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার ভিত্তি সম্ভবত ঋগ্বেদের অরণ্যানী সূক্ত (১০।১৪৬) যেটি অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা বনের রাজকন্যা অরণ্যানীকে নিবেদিত। ঋগ্বেদেরই অন্য একটি সূক্তে (৬।১২) অরণ্য বা বৃক্ষকে বন্ধু বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এই বৃক্ষেই যে ঈশ্বরের বাস একথা বলা হয়েছে অথর্ব বেদে (১২।৩)। মোট কথা, বেদে অরণ্য বা বৃক্ষ পেয়েছে একটি বিশেষ মর্যাদা। তাতে রয়েছে বনসংরক্ষণ এবং তার পূজার কথা। এই অরণ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সংস্কৃতি ও সাম্যের সৌগন্ধ। বেদের ওই ভাবনাই লোক জীবনে প্রতিভাত অরণ্য বা বৃক্ষমূলে ষষ্ঠীর আরাধনার মধ্যে। যতই লৌকিক বলা হোক, অরণ্যষষ্ঠীর পূজার মধ্যে বহমান কিন্তু সেই বৈদিক ধারাই।

শিশু-মঙ্গলময়ী

ভারতীয় ঐতিহ্যে অরণ্যের ভূমিকা সম্পর্কে প্রাথমিক এই আলোচনার পর ষষ্ঠী শব্দটির ওপর নজরটান দেওয়া যেতেই পারে।

ষষ্ঠী শব্দটি আক্ষরিক অর্থ ছয়। কিন্তু হিন্দু মননে ষষ্ঠী একটি তিথি। আবার এটি হলো প্রজনন এবং শিশু-মঙ্গলকারী এক দেবীরও নাম।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, ছয়— এই সংখ্যাবাচক শব্দটি ভারতীয় ভাবনার সঙ্গে নানাভাবে মিশে গেছে। এদেশে ঋতুর সংখ্যা ছয়। মানুষের শত্রু বা রিপু হিসেবে চিহ্নিতদের সংখ্যাও ছয়। দেব সেনাপতি কার্তিক ষড়ানন। কোনো কোনো পুরাণে দেবী ষষ্ঠীকেও বলা হয়েছে ষড়াননা। ভারতীয় দর্শনের সংখ্যাও ছয়। বেদাঙ্গের যে ক্রম তাও ওই ছয়— শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। আবার জ্যোতিষেও ছয়ের রয়েছে বিশেষ মাহাত্ম্য। সপ্তাহের বার-এর সংখ্যা ষষ্ঠ হলো শুক্রবার। এই বারটির অধিপতি শুক্র হলেন কাম ও প্রেম-দাতা। সম্পদ ও সমৃদ্ধিও দেন তিনি। সবচেয়ে বড়ো কথা, যে ক'টি উপাদান দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি তাদের সংখ্যাও ছয়। পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-এর সঙ্গেই রয়েছে ষষ্ঠ উপাদান মন বা আত্মা। প্রকৃতির এই ষষ্ঠাংশ থেকেই উদ্ভূত দেবী ষষ্ঠী। এমন কথাই বলা হয়েছে নানা পুরাণ বা বৈদিক গ্রন্থে।

এই দেবী ষষ্ঠীর উদ্ভব বা রূপ সম্পর্কে পুরাণ গ্রন্থগুলিতে রয়েছে নানা কাহিনি। এমন কথাও আছে দেবীষষ্ঠী প্রথমে ছিলেন শিশুঘাতিনী ভয়ংকরী। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনিই হয়েছেন শিশু কল্যাণ ও রক্ষার দেবী করুণাময়ী মাতা ষষ্ঠী।

মূল রয়েছে বেদে

পুরাণগুলির কোথাও এই দেবীকে বলা হয়েছে বিষ্ণুর এক মায়া। আবার কোথাও তিনি ব্রহ্মার মানসকন্যা, দেবসেনাপতি কার্তিকের স্ত্রী দেবসেনা। আবার কোনো পুরাণ মতে তিনি ষোড়শ মাতৃকার অন্যতম এক মাতৃকা। সিদ্ধ যোগিনীরূপে তিনি থাকেন সন্তানের পাশে— রক্ষা করেন সন্তানকে সব বিপদ এমনকী মৃত্যুর হাত থেকেও।

অরণ্য অর্চনার কথা পাওয়া যায় বেদের নানা সূক্তে। একই ভাবে দেবী ষষ্ঠীর রূপ কল্পনার আদি রূপটি ও লুকিয়ে আছে বেদ ও বৈদিক শাস্ত্রগুলিতেই। বেদের সংহিতা অংশে বহুবার বলা হয়েছে অগ্নিজাতক দেবতা স্কন্দের কথা। একই ভাবে ষড়বেদাঙ্গের অন্যতম 'কল্প'-এর অন্তর্ভুক্ত অগ্নিবেশ্য গৃহ্যসূত্র, কঠক গৃহ্যসূত্র প্রভৃতিতে পাওয়া যাবে স্কন্দ এবং স্কন্দপত্নী ষষ্ঠীর উপাসনার বিবিধ বিধির সন্ধান।

এই প্রসঙ্গেই বলতে হয়— 'মানব গৃহ্যসূত্রের' কথা। এই গ্রন্থে রয়েছে দেবী ষষ্ঠীর স্বতন্ত্র উপাসনা-বিধির কথা। সে বিধির নাম ষষ্ঠীকল্প। ষষ্ঠীকল্প অনুযায়ী প্রতি শুক্লাষষ্ঠী তিথিতেই করতে হয় দেবীর পূজা। দেবীর পূজা করে প্রার্থনা করা হয়, — ধনদাং বসুমিশানাং কামদাং সর্বকামিনাং— হে মা ষষ্ঠী, তুমি আমাদের পুত্র দাও, পশু-ধন-ধান্য ইত্যাদি নানাবিধ সমৃদ্ধি দাও। পুণ্য দাও, বিনাশ করো শত্রুদের। এ যেন চণ্ডীর অর্গলা স্তোত্রের— রূপংদেহি, জয়ংদেহি...রই অনুরণন।

এই ষষ্ঠী-কল্পের মধ্যে বেদের শ্রীসূক্তের বহু ঋক্ মিলেমিশে গেছে। একই সঙ্গে রয়েছে 'শ্রী', 'লক্ষ্মী' ইত্যাদি শব্দগুলিও। আর এসবেরই ইঙ্গিত, গৃহস্থের সার্বিক কল্যাণের জন্য সেই স্মরণাতীত কাল থেকেই ষষ্ঠী ও লক্ষ্মীর উপাসনা একই সঙ্গে হতো হিন্দুর ঘরে ঘরে। গবেষকদের অনুমান, মানব গৃহ্যসূত্র সংকলিত হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতকেরও আগে। অর্থাৎ ভারতে ষষ্ঠীর অর্চনার বয়স প্রায় আড়াই হাজার বছর।

বিবর্তনের ধারা

বিবর্তন এই জীব-প্রকৃতির ধর্ম। সেই ধারায় ষষ্ঠী পূজাবিধির ক্ষেত্রেও ঘটেছে নানা রূপ রূপান্তর। সেই রূপান্তরের পথেই ষষ্ঠীকাল পরিবর্তিত হয়েছে ষষ্ঠীব্রতে।

একটা সময় যিনি আদ্যাশক্তি দেবী মহামায়ার মতোই পূজিতা হতেন, যাঁর কাছে পার্থিব ও অপার্থিব সবকিছু প্রার্থনা করা হতো তিনিই কালান্তরে কেবল

শিশুমঙ্গলের বা শিশু রক্ষাকারিণীতে রূপান্তরিত হন। সেই রূপান্তরের কাহিনি রয়েছে মহাভারতের বনপর্বে, এমনটাই মনে করেন গবেষকরা।

সেই কাহিনিতে বলা হয়েছে, এক সময়— বালক কার্তিকেয়র প্রচণ্ড প্রতাপ দেখে শঙ্কিত হন দেবতারা। নিজেরা ওই শিশুকে দমন করতে না পেরে তাঁরা পাঠালেন লোকমাতাদের। বিভিন্ন উপায়ে শিশুহত্যায় পারদর্শিনী এই লোকমাতারা।

দেবতাদের নির্দেশে কার্তিক বা স্কন্দকে হত্যা করার জন্য আসেন লোকমাতারা। কিন্তু স্কন্দ-র রূপ দেখে তাঁদের অন্তর থেকে অন্তর্হিত হয় সবরকম হিংসা। হৃদয় ভরে উঠল একরকম অপত্য স্নেহে। স্কন্দও স্বীকৃতি দিলেন তাঁদের মাতৃস্নেহকে। শিশুঘাতিনী লোকমাতৃকারা হয়ে গেলেন স্কন্দজননী। আর তারপর থেকেই বিশেষ ভাবে শিশুমঙ্গলের দেবী হিসেবে শুরু হয় তাঁদের পূজা।

স্বর্গের দেবী মর্ত্যে

কেমন ভাবে হলো দেবী ষষ্ঠীর পূজার প্রবর্তন? এসম্পর্কে চোখ বোলানো যেতেই পারে মহাভারতে। বনপর্বে ঋষি মার্কণ্ডেয় দেবীর এই উদ্ভব কাহিনি শুনিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকে।

তিনি জানান, প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ থেকে দেবীর আবির্ভাব। তাই তাঁর নাম হয়েছে ষষ্ঠী। মার্কণ্ডেয় বলেন, প্রজাপতি দক্ষের ছিল দু'টি মেয়ে— দেবসেনা ও দৈত্যসেনা। একবার মানস সরোবরের তীরে বসে গল্পরত দুই বোন। এমন সময় সেখানে এসে হাজির দানব কেশী। সে মহাবলবান। আবার সেইরকমই নীতিহীন। দুই বোনকে দেখেই মোহিত কেশী নামক দৈত্য। বিয়ে করতে চায় তাদের। কেশীকে দেখে ভালো লাগে দৈত্যসেনার। তাই প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দানব কেশীকে পতিত্বে বরণ করে দৈত্যসেনা।

দেবসেনা কিন্তু নারাজ। আর তাতে

ষষ্ঠীদেবীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রাজা প্রিয়ব্রত সপুত্র ফিরে এলেন প্রাসাদে। তারপর এই মরলোকে প্রবর্তন করলেন ষষ্ঠী অর্চনার। জানালেন ষষ্ঠীর পূজা করলে মিটবে বেশিরভাগ পার্থিব প্রয়োজন। বললেন, এই ষষ্ঠীপূজা করতে হবে প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে। এই ভাবে এক এক মাসে ষষ্ঠী দেবী পূজিতা হবেন এক এক নামে।

ক্রুদ্ধ কেশী জোর করে তুলে নিতে যায় দেবসেনাকে। দেবসেনা আত্মরক্ষার জন্য চিৎকার করতে থাকে। সেই চিৎকার শুনে সেখানে আসেন দেবরাজ ইন্দ্র। দানব কেশীকে বিতাড়িত করেন তিনি সেখান থেকে।

বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে দেবসেনা এবার নিজের সুরক্ষার একজন শক্তিশালী পতির জন্য প্রার্থনা জানায় দেবরাজের কাছে। দেবরাজ এ ব্যাপারে পিতামহ ব্রহ্মার পরামর্শ চান। তাঁর পরামর্শ মতোই রুদ্রের পুত্র কার্তিকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয় দেবসেনার। এই দেবসেনাকেই ব্রাহ্মণরা দেবী ষষ্ঠী বলে অভিহিত করেন।

দেবী ষষ্ঠীর সঙ্গে কার্তিক বা স্কন্দ-র ধাত্রী মাতৃমণ্ডলী কৃত্তিকাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই-বা কেন, ছয় কৃত্তিকাই মিলে মিশে এক দেবী ষষ্ঠীতে রূপান্তরিত একথাও রয়েছে পুরাণের পাতায়। ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবী ভাগবত দু'টি পুরাণেই রয়েছে দেবী ষষ্ঠীর কাহিনি। সেখানে দেবমণ্ডলীতে স্থান পেয়েছেন ষষ্ঠী স্বতন্ত্র দেবী হিসেবে।

কাহিনি সূত্র

স্বর্গের দেবী ষষ্ঠীর পূজা মর্ত্যে কীভাবে শুরু হলো তার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে দেবী ভাগবতে। স্বয়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। বিয়ে হয়েছিল তার মালিনী নামে এক সুরূপার সঙ্গে। অবশ্য প্রিয়ব্রত প্রথমে বিয়ে না করে পরমতত্ত্ব জানার জন্য শুরু করেছিলেন কঠোর তপস্যা।

প্রিয়ব্রতর তপস্যা দেখে ব্রহ্মা একটু বিচলিত হন। মনুপুত্র তপস্বী হলে প্রজা সৃষ্টি করবে কে? তাই তিনি প্রিয়ব্রতকে বলেন, ওসব তপস্যা এখন ছাড়ো। বিয়ে করো। প্রজা বৃদ্ধি করো।

পিতামহ ব্রহ্মার আদেশ। তা অমান্য করতে পারেন না প্রিয়ব্রত। বিয়ে করলেন। স্ত্রী মালিনী। কেটে যায় দীর্ঘ দিন। অপুত্রক থাকেন তাঁরা। হয় না প্রজা সৃষ্টি, তাই পুত্রের কামনায় করলেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। কশ্যপ হলেন পুরোহিত। মালিনীকে দিলেন তিনি ষষ্ঠীর চরু।

চরু খেয়ে গর্ভবতী হলেন মালিনী। কিন্তু প্রসব আর হয় না। দশমাস নয়, কেটে গেল বারোটা বছর। অবশেষে জন্ম নিল

একটি সুদর্শন এক মৃত পুত্র। মৃত পুত্রকে নিয়ে যান শ্মশানে। সেখানে প্রবল শোক আচ্ছন্ন করে রাজাকে। শোক ও হতাশায় আত্মঘাতী হতে যান রাজা। আর সেই সময়েই দৃশ্যান্তর।

অকস্মাৎ আকাশ থেকে নেমে এল এক রথ। সেই রথে রয়েছেন এক শ্বেতবসনা সুন্দরী। সেই অপরূপাকে দেখে বিহ্বল রাজা জিজ্ঞেস করেন কে আপনি? কার কন্যা, কারই-বা বধূ?

প্রিয়ব্রতর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে সেই সুন্দরী, ব্রহ্মার মানসকন্যা আমি। নাম আমার দেবসেনা। পিতা আমাকে স্কন্দের হাতে দান করেছেন। মাতৃকাদের মনে আমি ষষ্ঠী নামে বিখ্যাত। আমি অপুত্রককে পুত্র দিই, দুঃখীকে দিই সুখ। আপন কর্মের কারণেই কেউ হয় পুত্রক আবার কেউ-বা অপুত্রক। এ জগতে রূপ, রস, ধন, যশ, আরোগ্য সবই মানুষ পায় তার কর্মের মূল্যে। পায় আমার কৃপা বা বরেও।

এসব বলতে বলতে দেবী ষষ্ঠী রাজা প্রিয়ব্রতের সেই মৃত পুত্রের দেহে করেন প্রাণের সঞ্চার।

আপন নন্দনকে জীবিত দেখে প্রিয়ব্রত তখন আনন্দে আত্মহারা। তিনি হলেন নন্দিত। কিন্তু সে আনন্দ যেন সাবানের একরাশ ফেনা। সেই অপরূপা মুহূর্তে তাঁর পুত্রকে নিয়ে আবার আকাশ পথে রথ চালনায় উদ্যত।

হতানন্দ রাজা প্রিয়ব্রত এবার মুখর দেবীর বন্দনায়। বলেন কৃপা করুন আমাকে! ফিরিয়ে দিন আমার পুত্রকে।

দেবী তুষ্ট রাজার স্তবে। শান্তকণ্ঠে তিনি বলেন— শোনো, মনুপুত্র রাজা প্রিয়ব্রত। তোমার পুত্রকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারি, তবে একটা শর্তে।

—শর্ত!

—হ্যাঁ, আমি দেব তোমার পুত্রকে। পরিবর্তে এই ধরাধামে আমার পূজা প্রবর্তন করতে হবে তোমাকে।

এক কথায় রাজি রাজা। পুত্রকে পেয়ে এই নরলোকে প্রবর্তন করলেন তিনি ষষ্ঠীপূজা ও ব্রতের।

দেবসেনা তথা ষষ্ঠীদেবী ফিরিয়ে দিলেন প্রিয়ব্রতর পুত্রকে। বললেন, সুব্রত হবে এই পুত্রের নাম। ভবিষ্যতে হবে এ এক মহান রাজা।

পূজার প্রবর্তন

ষষ্ঠীদেবীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে রাজা প্রিয়ব্রত সপুত্র ফিরে এলেন প্রাসাদে। তারপর এই মরলোকে প্রবর্তন করলেন ষষ্ঠী অর্চনার। জানালেন ষষ্ঠীর পূজা করলে মিটবে বেশিরভাগ পার্থিব প্রয়োজন। বললেন, এই ষষ্ঠীপূজা করতে হবে প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে। এই ভাবে এক এক মাসে ষষ্ঠী দেবী পূজিতা হবেন এক এক নামে। যেমন বৈশাখের ষষ্ঠী হচ্ছেন ধূলাষষ্ঠী বা চন্দন ষষ্ঠী বা চান্দনী ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠমাসে অরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ় মাসে কোড়া ষষ্ঠী, শ্রাবণে লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্রে চাপড়া ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা বা বোধন ষষ্ঠী, কার্তিকে নাড়ী বা কার্তিক ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে মূলাষষ্ঠী, পৌষে পাটাই ষষ্ঠী, মাঘে শীতল ষষ্ঠী, ফাল্গুনে অশোক ষষ্ঠী আর চৈত্র মাসে স্কন্দষষ্ঠী।

রাজা প্রিয়ব্রত আরও বলেন— দেবীর পূজা করা যাবে শালগ্রাম শিলায়, বটগাছের নীচে পূর্ণঘটে বা পটে। সেই ধারাতে এখনও পল্লীবাঙ্গলায় মহিলারা দলবেঁধে গ্রামেই কোনো বট বা অশ্বত্থগাছের তলায় ষষ্ঠীপূজা করে থাকেন। বহু জায়গাতেই এইসব জায়গা ষষ্ঠীর থান বা ষষ্ঠীতলা নামেও পরিচিত।

মূর্তির রূপ কল্পনা

সম্ভবত পৌরাণিক যুগেই ষষ্ঠীর মূর্তিপূজার সূচনা হয়। দেবীর রূপ পরিকল্পনায় রয়েছে আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রীর আভাস। ধ্যানমন্ত্র অনুযায়ী, ষষ্ঠী দেবী হলেন গৌরবর্ণা, দ্বিভুজা, নানা অলঙ্কারে ভূষিতা। তাঁর বাঁ কোলে রয়েছে এক বা একাধিক সন্তান। তিনি 'প্রসন্নবদনাং ধ্যায়েজ্জগধাত্রীং সুখ প্রদাম্'— জগদ্ধাত্রী রূপে তিনি সর্ব সুখদাত্রী। জগদ্ধাত্রীর বাহন বাঘের পরিবর্তে তাঁর বাহন বিড়াল— যার অন্য নাম বাঘের মাসি। গবেষকদের মতে বিড়াল হচ্ছে বহু প্রজননের প্রতীক।

একথা সত্য, ষষ্ঠীর পূজা ও ব্রত পালন করেন মূলত মহিলারাই। অরণ্য ষষ্ঠীর সময় সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে জামাতাদের কল্যাণের জন্য পালন করেন তাঁরা। এই পূজার উপকরণের মধ্যে রয়েছে তালপাতার পাখা, বাঁশের কোড়ল, ধানদূর্বা, খেজুর, করমচা আর কচি সুপারি। সবগুলিই একদিক থেকে সহজলভ্য। একইসঙ্গে সবগুলির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে বাঙ্গলার কৃষিসম্পদ। অর্থাৎ একটি পৌরাণিক পূজা ও ব্রতর অনুষঙ্গ হচ্ছে বাঙ্গলার কৃষি।

আগেই বলা হয়েছে, অরণ্য ষষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ত্যাগ ও ভোগ। একটু খোলা চোখে দেখলে দেখা যাবে, ওইদিন যে মা সন্তান বিশেষ করে জামাইয়ের জন্য নানা অন্নব্যঞ্জন তৈরি করেন প্রায় একা হাতে, তিনি ব্রত অনুযায়ী নিজে থাকেন প্রায় উপবাসী বা খান সামান্য জলভাত। এক্ষেত্রে তিনি যেন ত্যাগের এক প্রতিমূর্তি।

জামাই ষষ্ঠী

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলতে হয়, বয়সের দিক থেকে অরণ্যষষ্ঠী অতি প্রাচীন। কিন্তু বর্তমানে দিনটি প্রায় হারিয়ে গেছে 'জামাই ষষ্ঠী'র আড়ালে। অথচ এই 'জামাইষষ্ঠী' অতি সাম্প্রতিকের। সব মিলিয়ে এটির বয়স মাত্রই দুশো থেকে আড়াইশো বছর। গবেষকদের অভিমত, মহিলারা যে সাবিত্রী চতুর্দশী পালন করেন স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনায়, তা দেখে তৎকালীন বাবু সম্প্রদায়ের কিছু উদ্যোগী, জামাইদের জন্য এই প্রবর্তন করেন এই অনুষ্ঠানের। তাঁরা বলেন, এই জামাই আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে বাবা মা-রা মেয়েকে দেখা এবং কাছে পাওয়ার একটা সুযোগ পাবে। বলা যায়, একরকম উৎকোচের মাধ্যমে শ্বশুরবাড়িতে কন্যার অবস্থানকে দৃঢ় করা ছিল হয়তো তাঁদের লক্ষ্য।

শেষ কথা, এই অরণ্য ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী হলো মাতৃত্ব, অপত্য স্নেহ, বংশ রক্ষার এক আধ্যাত্মিক উদ্‌যাপন সমস্ত মিলিয়েই এটি হলো পারিবারিক বন্ধনের এক অনন্য ও অপূর্ব নিদর্শন। □

সমুদ্র, নদী ও একশো বছরের বঙ্গদেশ

ড. সৌম্যজিৎ রায়

ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সত্য হলো— মহানগর সৃষ্টি হয় না ইট-পাথর দিয়ে। মহানগর সৃষ্টি হয় ভাবনা বা কল্পনা দিয়ে। সভ্যতার ইতিহাসে যেসব শহর পৃথিবীর মানচিত্র বদলে দিয়েছে, তাদের সৃষ্টি কখনওই কংক্রিটের অরণ্যে হয়নি। সেগুলি জন্ম নিয়েছিল নদীর ধারে, সমুদ্রের কিনারায়, বাণিজ্যপথের পাশে, মানুষের স্বপ্নের ভিতরে। ইতিহাসের এই পরিবর্তন রাতারাতি ঘটেনি। এটি ঘটেছিল, কোনও এক সময়ে কেউ ভবিষ্যৎকে কল্পনা করার সাহস দেখিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেরও আজ সেই কল্পনার সময় এসেছে। হুগলী, রূপনারায়ণ ও বঙ্গোপসাগরের মিলনভূমি; হলদিয়া ও তার আশপাশ; আগামী পঞ্চাশ বছরে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের কেন্দ্র হতে পারে।

যেখানে আজ জেলেপাড়া, নদীর ঘাট, কাদামাটি, ট্রলার, নোনা বাতাস আর ছোট্ট বাজার রয়েছে, সেখানেই একদিন উঠে দাঁড়াতে পারে কাচের টাওয়ার, স্মার্ট বন্দর, সবুজ নদীতীর, বৈদ্যুতিক জলযান, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্র এবং পৃথিবীর নতুন প্রজন্মের পরিবেশবান্ধব শহর।

এ কোনও অলীক কল্পনা নয়। ভুগোল, সমুদ্রনীতি, জলপথ অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দৃষ্টিতে দেখলে হলদিয়া অঞ্চল আজ ভারতের অন্যতম সম্ভাবনাময় ডেল্টা-করিডোর। বিশ্বব্যাপী এখন 'ব্লু ইকোনমি' বা সমুদ্রভিত্তিক অর্থনীতির উত্থান ঘটছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসাব অনুযায়ী, আগামী কয়েক দশকে সমুদ্র অর্থনীতি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে। ভারতও ইতিমধ্যে সাগরমালা' প্রকল্পের মাধ্যমে উপকূলভিত্তিক উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছে। ভারতের ৭৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং বিশাল নদীপথ আগামী অর্থনীতির নতুন মেরুদণ্ড হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন হলো, পশ্চিমবঙ্গ কি সেই ভবিষ্যতের নেতৃত্ব নেবে? কারণ পশ্চিমবঙ্গের কাছে আজও রয়েছে— সমুদ্রের প্রবেশদ্বার, ঐতিহাসিক বন্দর, নদীকেন্দ্রিক ভৌগোলিক সুবিধা, শিক্ষিত মানবসম্পদ এবং সর্বোপরি এক গভীর সাংস্কৃতিক পরম্পরা। এই নতুন স্বপ্নের কেন্দ্র হতে পারে তিনটি অঞ্চল— কুকড়াহাটি, গেঁওখালি ও নয়াচর।

হলদিয়া— নতুন পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক অক্ষ : হলদিয়াকে শুধু একটি শিল্পশহর হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এটি আসলে পূর্ব ভারতের একটি সম্ভাব্য 'মেরিটাইম গ্রোথ নোড'। আজও হলদিয়া ডক কমপ্লেক্স পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর পরিকাঠামো। তৈল শোধনাগার, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, রাসায়নিক উৎপাদন, সার শিল্প, কন্টেনার পরিবহণ— সব মিলিয়ে এটি পূর্ব ভারতের শিল্প অর্থনীতির একটি প্রধান ভিত্তি। কিন্তু আগামীদিনের বিশ্ব শুধু পুরনো শিল্পের উপর দাঁড়াবে না। আগামীদিনের শহর হবে— ডেটা-চালিত, জলবায়ু-সহনশীল, সবুজ শক্তিনির্ভর এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সমৃদ্ধ। বিশ্বের বড়ো বড়ো নগরায়ণ প্রকল্পগুলি এখন নদী ও সমুদ্রকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে গড়ে উঠছে। সাংহাই, রটারডাম, সিঙ্গাপুর, দুবাই— প্রত্যেকেই বুঝেছে, সমুদ্র ও জলপথ আগামী শতাব্দীর অর্থনীতির প্রাণশক্তি।

পশ্চিমবঙ্গও পারে। হলদিয়াকে কেন্দ্র করে যদি একটি পরিকল্পিত 'ডেল্টা মেগা-রিজিয়ন' তৈরি করা যায়, তবে এটি হতে পারে— পূর্ব ভারতের বৃহত্তম লজিস্টিক করিডোর, সমুদ্র অর্থনীতির কেন্দ্র, জলবায়ু প্রযুক্তির গবেষণাক্ষেত্র, ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের নতুন গন্তব্য। চীনের পার্ল রিভার ডেল্টা যেমন শেনজেন, ঝুহাই ও গুয়াংঝৌকে একত্রে একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক বলয়ে পরিণত করেছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও হলদিয়া অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নতুন নগরসভ্যতার জন্ম দিতে পারে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুযায়ী হলদিয়াকে কেন্দ্র করে বঙ্গোপসাগরে নৌসেনার একটি শক্তিশালী ঘাঁটিও গড়ে উঠতে পারে। সমুদ্র সুরক্ষা আঁটোসাঁটো হলে আঞ্চলিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে।

কুকড়াহাটি— পশ্চিমবঙ্গের নদী-দ্বার : কলকাতা ও হলদিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কুকড়াহাটি। আজ সেখানে নদীর হাওয়া, ফেরিঘাটের ব্যস্ততা, ট্রলারের শব্দ এবং ধীর জীবনের ছন্দ। কিন্তু আগামীদিনের দৃষ্টিতে দেখলে, কুকড়াহাটি এক সম্ভাব্য 'গেটওয়ে সিটি'। বিশ্বের বহু মহানগরের জন্ম হয়েছে এমন ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে যেখানে নদী, বন্দর ও বাণিজ্যপথ মিলিত হয়েছে। কুকড়াহাটির ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনা স্পষ্ট।

যদি ভবিষ্যতে কলকাতা, হলদিয়া দ্রুতগতির এক্সপ্রেসওয়ে, আধুনিক নদীসেতু, সাবমেরিন টানেল, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট বন্দর এবং বৈদ্যুতিক জলযান করিডোর গড়ে ওঠে, তবে কুকড়াহাটি পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহত্তম লজিস্টিক ও ফিনান্স হাবে পরিণত হতে পারে।

জাতীয় জলপথ-১, যা গঙ্গা দিয়ে উত্তর ভারত পর্যন্ত সংযুক্ত, তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হতে পারে এই অঞ্চল। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দুই দশকে ভারতের জলপথ পরিবহণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। কারণ জলপথে মাল পরিবহণ সস্তা, কম দূষণকারী এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী।

কুকড়াহাটিকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে আন্তর্জাতিক লজিস্টিক পার্কডেটা সেন্টার, ফিনটেক সিটি, গ্রিন হাইড্রোজেন টার্মিনাল, বৈদ্যুতিক যানবাহন শিল্পাঞ্চল, এবং স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম।

কিন্তু শুধু অর্থনীতি দিয়ে শহর তৈরি হয় না। একটি সত্যিকারের আধুনিক শহরের দরকার নদীতীরের উন্মুক্ত সৌন্দর্য,শিল্পকলা, সংস্কৃতি কেন্দ্র, সাইকেল করিডোর, হাঁটার পথ এবং মানুষের জন্য সম্মানজনক নাগরিক জীবন। কারণ ভবিষ্যতের শহর শুধু কাজের জায়গা হবে না; সেটি হবে জীবনের জায়গা।

গেঁওখালি— নদীর সঙ্গমে ভবিষ্যতের শহর : গেঁওখালিতে দাঁড়ালে মনে হয় নদী যেন নিজের ভাষায় কবিতা লিখছে। হুগলী, রূপনারায়ণ ও দামোদরের সঙ্গম পশ্চিমবঙ্গের ভূগোলের এক অনন্য বিস্ময়। এই অঞ্চল শুধু সুন্দর নয়; কৌশলগতভাবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্বের বহু উন্নত শহর নদীর সঙ্গমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। কারণ নদী মানে বাণিজ্য, পরিবহণ, জ্ঞান ও সভ্যতার প্রবাহ। গেঁওখালি ভবিষ্যতে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'রিভার সিটি' হতে পারে।

এখানে যদি পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে সামুদ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়, জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্র, ব্লু ইকোনমি ইনস্টিটিউট, স্মার্ট রিভারফ্রন্ট, আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার এবং বৈজ্ঞানিক পর্যটন পরিকাঠামো, তবে গেঁওখালি ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ 'ওয়াটারফ্রন্ট সায়েন্স সিটি' হয়ে উঠতে পারে।

ভাবা যায়, একদিন সন্ধ্যায় নদীর ধারে মানুষ হাঁটছে, দূরে সৌরশক্তিচালিত ফেরি চলছে, ড্রোন নদীপথ পর্যবেক্ষণ করছে,আর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষকরা জলবায়ু পরিবর্তন ও ডেল্টা ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছেন? পশ্চিমবঙ্গ আবার নদীকেন্দ্রিক সভ্যতার নেতৃত্ব দিতে পারে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের আত্মা নদীর মধ্যেই বাস করে।

নয়াচর— ভবিষ্যতের সবুজ দ্বীপ :

নয়াচর আজও অনেকটাই নীরব। কিন্তু ইতিহাস বলে, নীরব ভূখণ্ডের মধ্যেই কখনও কখনও ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড়ো সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। বিশ্ব যখন জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটে দাঁড়িয়ে, তখন আগামীদিনের শহরকে শুধু উন্নত হলেই চলবে না; সেই শহরকে হতে হবে 'স্থায়ী, সেই উন্নয়নকে হতে হবে 'সুষম'।

নয়াচর সেই পরীক্ষাগার হতে পারে। এখানে পুরনো ধরনের দূষণনির্ভর শিল্প গড়ে তোলা উচিত নয়। বরং এটি হতে পারে কার্বনদূষণহীন নগর পরিকল্পনার মডেল, সৌরশক্তি ও জোয়ারভাটা শক্তির কেন্দ্র, গভীর সমুদ্র মৎস্যচাষ অঞ্চল, আন্তর্জাতিক ইকো-ট্যুরিজম জোন, ম্যানগ্রোভ গবেষণা কেন্দ্র এবং বৈদ্যুতিক জলযানের পরীক্ষাগার।

বিশ্বের বহু দেশ এখন 'ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট সিটি' তৈরির দিকে এগোচ্ছে। নেদারল্যান্ডস্, সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি উপকূলীয় নগর পরিকল্পনায় বিপুল বিনিয়োগ করছে। পশ্চিমবঙ্গও পারবে।

নয়াচরে গড়ে উঠতে পারে ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পরিবেশবান্ধব আবাসন, জলাভূমি সংরক্ষণ অঞ্চল, আধুনিক মৎস্য অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন। এখানে 'উন্নয়ন' মানে প্রকৃতিকে ধ্বংস করা নয়। 'উন্নয়ন' মানে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান। সুন্দরবন আমাদের শিখিয়েছে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে উপকূলে সভ্যতা স্থায়ী হয় না।

নতুন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি— শিল্প থেকে জ্ঞানসভ্যতা : একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আগামীদিনের শক্তি শুধু উৎপাদনে নয়--- উদ্ভাবনে। ভবিষ্যতের শহর হবে এআই-চালিত, তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব বা সবুজ শক্তিনির্ভর এবং আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত। হলদিয়া অঞ্চলে গড়ে উঠতে পারে আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্র ও অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়, সামুদ্রিক প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কেন্দ্র, ব্লু ইকোনমি গবেষণাগার এবং স্টার্টআপ করিডোর।

পশ্চিমবঙ্গের তরুণ প্রজন্ম আজও দেশের অন্যতম শিক্ষিত মানবসম্পদ। কিন্তু কর্মসংস্থানের অভাবে এরাজ্যের মেধা অন্য রাজ্যে বা বিদেশে চলে যাচ্ছে। যদি হলদিয়া অঞ্চলকে আগামী পঞ্চাশ বছরের 'নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল' হিসেবে পরিকল্পনা করা যায় তবে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। নতুন প্রজন্মের জন্য তৈরি হতে পারে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি শিল্প, সৃজনশীল অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্র।

রাজনৈতিক দৃষ্টি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রয়াস :

এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড়ো শর্ত হলো দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক দৃষ্টি। কারণ 'মহানগর' এক দিনে তৈরি হয় না। শেনজেন তৈরি হতে চল্লিশ বছর লেগেছে। সিঙ্গাপুরের আধুনিক রূপ গড়তে কয়েক দশক সময় লেগেছে। দুবাইও রাতারাতি তৈরি হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গকেও যদি নতুন করে উঠতে হয়, তবে দরকার দীর্ঘমেয়াদি নগর পরিকল্পনা, রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, স্বচ্ছ প্রশাসন, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এটি হলো আগামী একশো বছরের পশ্চিমবঙ্গ গড়ার স্বপ্ন।

শেষ কথা : নদীর দিকে আবার তাকাক পশ্চিমবঙ্গ। একদিন সমুদ্রপথে বিশ্বকে চিনেছিল বঙ্গভূমি। তাম্রলিপ্ত থেকে জাহাজ গিয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। কলকাতা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। গঙ্গা ছিল বাণিজ্যের মহাসড়ক। তারপর ধীরে ধীরে নদীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বঙ্গপ্রদেশ। সম্ভবত আবার সময় এসেছে নদীর দিকে ফিরে তাকানোর। হয়তো একদিন ইতিহাস লিখবে— হলদিয়ার ধারের ছোট্ট জেলেপাড়াগুলির দিকেই প্রথম তাকিয়েছিল নতুন পশ্চিমবঙ্গ। কারণ সভ্যতার প্রথম কাজই হলো--- অসম্ভবকে কল্পনা করার সাহস রাখা।

(লেখক ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ-এর গবেষক)

বড় কাঁচা নাটক

খেলতে নেমে ওয়াকওভার দিতে হলো তৃণমূলের তথাকথিত যুবরাজকে

এতদিন এজেন্সি নির্ভর রাজনীতি করা অভিষেক ব্যানার্জি একটু অন্য খেলা খেলতে নেমেছিলেন ভোটযুদ্ধে পরাজিত হবার পর। নিজের দলের সমর্থকদের দিয়ে কিছু একটা ঘটানো, আর সেই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সহানুভূতির ঝড় তোলা। সেই গেমপ্ল্যান যে বড়ই কাঁচা ছিল, তা বুঝতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল অভিষেকের।

বিশ্বপ্রিয় দাস

নাটকটা জমল না। বড় দুর্বল স্ক্রিপ্ট। স্টেজ একেবারে ঠিক ঠাক ছিল। এমনকী পাত্র-পাত্রী সব ঠিক ছিল। বাদ সাধল স্থানীয় সাধারণ মানুষ। রাজ্যের প্রাক্তন যুবরাজকে তাঁরা এমন হেনস্থা করল যে অতি বড় রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বক্তাও কল্পনাতে আনতে পারেননি। সোনারপুরে অভিষেক ব্যানার্জির হেনস্থার চিত্রনাট্য যে এভাবে ফ্লপ হবে, সেটি স্বয়ং যুবরাজ নিজেও কি ভেবেছিলেন? ভোট-পরবর্তী হিংসায় তৃণমূলকর্মী সঞ্জু কর্মকার নিহত হয়েছেন বলে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি। যদিও স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য ওই অঞ্চলে এরকম কোনো ঘটনাই ঘটেনি। সঞ্জু কর্মকারের মৃত্যুর কারণ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তার পরিবারও। এমনকী যুবরাজ অভিযোগ তুললেও মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানিয়ে স্থানীয় থানায় কোনো এফআইআরও দায়ের করা হয়নি। এমতাবস্থায় মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সোনারপুরের দিকে রওনা হলেন তিনি। সাজানো চিত্রনাট্যে সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যেভাবে ঘটল, সেটা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। সেদিন যা ঘটল তা যে একেবারে পরিকল্পিত ঘটনা, সেটার প্রমাণ সোনারপুরের স্থানীয় মানুষেরাই দিয়েছেন। এই ঘটনায় যে ক'জন আটক হয়েছে পুলিশের হাতে, তারা কোনো না কোনোভাবে প্রাক্তন শাসক দল ঘনিষ্ঠ, স্থানীয় মানুষেরা সেকথা বলেছেন।

এই নাটক যখন জমলো না, তখন হাসপাতালে ভর্তি হবার একটা চেষ্টা হলো। কেননা, হাসপাতালে ভর্তি থাকলে এড়ানো যাবে ভবানী ভবনের তলব। এতদিন তৃণমূল শাসকের অঙ্গুলিহেলনে হাসপাতালগুলি অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক এমন কাজ করেছে, যা করা উচিত ছিল না। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দু'টি বেসরকারি হাসপাতাল ফেরাল অভিষেককে। ফলে একেবারে প্রথম রাউন্ডেই যুবরাজের কৌশল ধরাশায়ী সাধারণ মানুষের কাছে।

রাজ্যে শাসকের পালাবদল ঘটেছে। একেবারে পর্যুদস্ত রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দল— তৃণমূল কংগ্রেস। দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটেছে। এই পনেরো বছরে রাজ্যের মানুষ নানা কারণে অত্যাচারিত, বঞ্চিত, শোষিত, অবহেলিত হয়ে তৃণমূল জমানার অবসান ঘটিয়েছে। যদিও এখনও এই পরাজয়কে মেনে

নিতে পারছে না প্রাক্তন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তারা এখনও মনে করছে যে তাদের ঔদ্ধত্যের সেই প্রভাব, তাদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা, তাদের কলুষিত করা গণতন্ত্র, জনতা জনার্দনের রায়ে নির্বাচিত একটি সরকারের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির পরেও সাধারণ মানুষ তাদের ভালোবেসে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবেন।

মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চলেছে রাজ্য জুড়ে। নানাভাবে বঞ্চিত, অত্যাচারিত সাধারণ মানুষের মনে জেগে উঠেছে প্রতিবাদের একটা অন্য ভাষা। যে ভাষার উত্তাপে ছারখার হয়ে যাচ্ছে সিন্ডিকেটরাজ, ছারখার হয়ে যাচ্ছে গত পনেরো বছর ধরে চলা দমন-পীড়নের রাজনীতির প্রাসাদ। দমবন্ধ রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখন এক মুক্তির আনন্দের মধ্যে প্রকাশ করছেন প্রতিবাদ। এক্ষেত্রে সংযত ও সংযমী রাজ্যের বর্তমান শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি। গত দু'টি নির্বাচনে তারা পরাজিত হওয়ার পর তাদের বহু কর্মী ও সমর্থকদের প্রাণ হারাতে হয়েছে প্রাক্তন শাসক দল তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের আঘাতে। বহু মহিলাকে হতে হয়েছে চরমভাবে লাঞ্ছনার শিকার। তবুও রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পর সংযম দেখিয়ে চলেছে বিজেপি। তাদের সমর্থকদের সম্পর্কে কোনোরকম অভিযোগ পেলেই, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পিছপা হচ্ছে না ভারতীয় জনতা পার্টি। ফলে এই একমাসে রাজ্যের কোথাও একটিও ঘটনা দেখা যাবে না— যেখানে প্রতিহিংসার রাজনীতির প্রকাশ ঘটেছে। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দল জনমানসে তাদের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার জন্য নানা নাটক তৈরির পরিকল্পনা নিতে শুরু করেছে। সেই পরিকল্পনায় প্রথমেই রয়েছে জায়গায় জায়গায় অশান্তি তৈরি করা। একটি সূত্র বলছে— যদি বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি করা যায়, তাহলে খুব অল্প সময়েই নতুন সরকারের ওপর থেকে মানুষের আস্থা কমতে শুরু করবে। এরপর জঙ্গল মহল সমেত বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের ওপর নানাভাবে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করার চেষ্টা হতে পারে।

দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমল নেতা স্বরূপ বিশ্বাস

ক্ষমতায় আসার আগে যেমনটি আগের শাসক দল করেছিল। সেই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল এক মহিলা নেত্রী এবং এক নেতা, যিনি পরবর্তীতে উপহারস্বরূপ মন্ত্রিত্বও পেয়েছিলেন। রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দলের যুবরাজকে সোনারপুরে হেনস্থা করার পিছনেও রয়েছে সেই ধরনের গেমপ্ল্যান।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না তার দলের অধিকাংশ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। ফলে ছক তৈরির ক্ষেত্রে একটু যে বেগ পেতে হচ্ছে, সেটা প্রমাণিত। আর তার মাটির কাছে থেকে রাজনীতি না করা, প্যারাশ্যুট নেতা তথাকথিত তৃণমূলের যুবরাজ, অভিষেক ব্যানার্জির ক্ষেত্রে জল মাপতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে। এতদিন এজেন্সি নির্ভর রাজনীতি করা অভিষেক ব্যানার্জি একটু অন্য খেলা খেলতে নেমেছিলেন ভোটযুদ্ধে পরাজিত হবার পর। সেই খেলা ছিল নিজের দলের কিছু সমর্থকদের দিয়ে কিছু একটা ঘটানো। আর সেই ঘটনা ঘটার মধ্যে দিয়ে সহানুভূতির ঝড় তোলা। সেই গেমপ্ল্যান যে বড়ই কাঁচা ছিল, তা বুঝতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল অভিষেকের, মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তার দল যে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে, সেটাও হয়তো বুঝছিলেন সাত লাখি সাংসদ। তাই একটা গিমিকের খেলা খেলতে নেমেছিলেন, যেমনটি খেলে থাকেন তার পিসি, এরাজ্যের সদ্য-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে দলের মধ্যেকার চোরা বিদ্রোহ যে অভিষেককে ঘিরে ফেলেছে, সেটাও হয়তো টের পেয়েছেন দলনেত্রী। ফলে তার সঙ্গে যে নিজের হাতে গড়া দল আর সাথ দেবে না— সেটাও বুঝে গেছেন তিনি। ফলে তিনি হয়তো এই আশঙ্কাও করছেন যে, আগামীদিনে তার দল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। এদিকে, একে একে পুলিশের হাতে পাকড়াও হচ্ছে দলের বিধায়ক থেকে পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য, পুরপ্রধান, কাউন্সিলর। দুর্নীতির একেবারে শিখরে তারা যে ছিল, সেটাও প্রমাণিত হচ্ছে। একটি দল ২০১১ সালে মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ৩৪ বছরের বাম অপশাসন থেকে মুক্তি দিয়েছিল আপামর পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে। ৩৪ বছর ধরে এরাজ্যে ছিল এলসিএম রাজ, আর পরবর্তী ১৫ বছরে তৃণমূলের সিন্ডিকেট রাজ। এই জাঁতাকলে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে গিয়েছে কয়েক দশক। সেখান থেকে এই রাজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটানো যে বেশ কষ্টসাধ্য, সেটা নতুন সরকার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

আবার খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে এক বিশাল অঙ্কের ঋণের বোঝাও চাপিয়ে দিয়ে গেছে বামফ্রন্ট সরকার ও তৃণমূল সরকার। ফলে সেসব সামলে এগোতে যে বেশ খানিকটা সময় লাগবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বাধীন সরকারের, সেটা অতি বোকাও বলতে বাধ্য হবেন। একটি বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে জানা গিয়েছে যে, আগামী কয়েক মাস একেবারে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন তৃণমূলনেত্রী। সেখানে উঠে আসবে তার ভাইপোর ওপর আক্রমণ, কর্মীদের ওপর আক্রমণ, জায়গায় জায়গায় বিজেপি কর্মীদের হুজ্জুতি, বিজেপি'র নানা সামাজিক প্রকল্প পেতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির অভিযোগ-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি। এরাজ্যে নানাভাবে চরম অরাজকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে শেষ মরণকামড় বসাবে তৃণমূল কংগ্রেস। □

পশ্চিমবঙ্গের অভয় ও ঋতুর হাত ধরে বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের সোনাঝরা সূচনা

নিলয় সামন্ত

ভারতের মাটিতে শুরু হওয়া প্রথম বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপেই যেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের জোরালো ঘোষণা করে দিল আয়োজক দেশ। উদ্বোধনী দিনে ছয়টি ইভেন্টের মধ্যে পাঁচটিতেই সোনা জিতে ভারত শুধু পদক তালিকার শীর্ষে উঠে আসেনি, বরং বিশ্বমঞ্চে যোগাসনের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বও নিজেদের হাতেই রাখতে চায়, সেই বার্তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই ঐতিহাসিক সাফল্যের শুরুটা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দুই কৃতী যোগাসন অ্যাথলিট অভয় বর্মন ও ঋতু মণ্ডলের হাত ধরে। সিনিয়র পুরুষ ও সিনিয়র মহিলা বিভাগে সোনা জিতে তাঁরা ভারতের পদক অভিযানকে সোনালি রঙে রাঙিয়ে দেন। আমেদাবাদের একা এরিনায় উপস্থিত দর্শকদের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।

বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে ভারতের প্রথম সোনার পদক জেতার কৃতিত্ব অর্জন করেন অভয় বর্মন। ট্র্যাডিশনাল যোগাসন বিভাগের সিনিয়র পুরুষ বিভাগে তিনি ৬৩.৪২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানে শেষ করেন। ইন্দোনেশিয়ার আরকান রিয়ান্তো ৫৭.২৩ পয়েন্ট নিয়ে রুপো পান এবং উজবেকিস্তানের অ্যালান ৫৩.২১ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন।

অভয়ের পরই ভারতের সাফল্যের ধারাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলেন পশ্চিমবঙ্গেরই ঋতু মণ্ডল। সিনিয়র মহিলা বিভাগে ৬৪.৩৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে তিনি সোনার পদক জেতেন। কাজাখস্তানের আইঝান কুয়ানিশবায়েভা ৫৮.৯৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় এবং হংকঙের লা ম ঙ্গা মান ৫৬.৯৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হন।

মাত্র ২০ বছর বয়সে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দ লুকিয়ে রাখতে পারেননি ঋতু। তিনি বলেন, 'বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রত্যেক যোগাসন অ্যাথলিটের কাছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ভারতের হয়ে সোনা জেতা আমার স্বপ্ন ছিল। ১২ বছর বয়স থেকে অনুশীলন শুরু করেছিলাম। আট বছরের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ এবং নিষ্ঠার ফল আজ পেলাম। আমার কোচ, ম্যানেজার এবং পুরো দলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।' ভারতের আধিপত্যের মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল সিনিয়র এ পুরুষ বিভাগ। সেখানে সিঙ্গাপুরের নাথানিয়েল ট্যান লিয়ং আন ৫৫.৩৭ পয়েন্ট পেয়ে সোনা জিতে ভারতকে পূর্ণ আধিপত্য থেকে বঞ্চিত করেন। তানজানিয়ার করিমু স্বাফি রুপো এবং ভারতের সুমির গ্লাওয়ালি ব্রোঞ্জ পদক জেতেন।

তবে সেই সাময়িক ধাক্কা দ্রুত কাটিয়ে ওঠে ভারত। সিনিয়র 'এ' মহিলা বিভাগে ঋতু ঠাকুর ৬৩.৫০ পয়েন্ট সংগ্রহ করে সোনা জেতেন। আর্জেন্টিনার নাবিলা সল বারাজা মাত্র দেড় পয়েন্টেরও কম ব্যবধানে দ্বিতীয় হন। কেনিয়ার আওর সাউলিনা ব্রোঞ্জ পান।

এরপর সিনিয়র 'বি' পুরুষ বিভাগে রোশন থাপা ভারতের পদক ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করেন। ৬৫.৬৭ পয়েন্ট পেয়ে তিনি সোনা জেতেন। বাংলাদেশের মহম্মদ মামুন খানবাবু রুপো এবং কিরঘিজস্তানের দানিল রাইকভ ব্রোঞ্জ পদক পান।

দিনের শেষে সোনাটি আসে টুইস্টিং বডি ইন্ডিভিজুয়াল সিনিয়র 'বি' মহিলা বিভাগে। জ্যোতি দেওরকর ৪৬.১৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে স্বর্ণপদক জেতেন। ওমানের অলিমুখু নাভামানি এবং জাপানের সাওরি কিয়েই যথাক্রমে রুপো ও ব্রোঞ্জ পান। প্রথম দিনের শেষে ভারতের এই সাফল্য শুধু পদকের সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি যোগাসনের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে। হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য হিসেবে যোগাসন দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্যচর্চা, মানসিক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে যোগাসনকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া হিসেবে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার চেষ্টা জোরদার হয়েছে। সেই প্রচেষ্টারই সবচেয়ে বড়ো পদক্ষেপ এই বিশ্ব যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ।

এই প্রতিযোগিতায় ভারত ১২২ সদস্যের একটি বিশাল দল নামিয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা সাব-জুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র, সিনিয়র 'এ', সিনিয়র 'বি' এবং সিনিয়র 'সি'— মোট ছয়টি বয়সভিত্তিক বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রথম দিনের ফলাফল দেখার পর স্পষ্ট, স্বাগতিক দেশের লক্ষ্য শুধুমাত্র পদক জয় নয়। ভারত চাইছে বিশ্বের সামনে দেখাতে যে, যোগাসনের জন্মভূমি এখনও এই ক্রীড়ার সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র। আর সেই স্বপ্নপূরণের পথে প্রথম পদক্ষেপেই সোনার আলো ছড়ালেন পশ্চিমবঙ্গের অভয় বর্মন ও ঋতু মণ্ডল। তাঁদের সাফল্য শুধু ভারতের নয়, পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া মানচিত্রেও এক নতুন গর্বের অধ্যায় যোগ করল।

বিশ্ব যোগাসনের ইতিহাসে প্রথম অধ্যায় লেখা শুরু হয়েছে আমেদাবাদে। আর সেই ইতিহাসের প্রথম পাতাতেই উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রইল ভারতের নাম। □

ব্যবহারেই মানুষ চেনা যায়

এক রাজা ছিলেন। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ তাঁর রাজ্যে চাকরির খোঁজে আসত। একদিন সকালে দরবারে একজন লোক এসে অভিবাদন জানিয়ে বলল— মহারাজ, আমি আপনার সেবায় যোগ দিতে চাই। রাজা একটু হেসে বললেন,

তোমার বিশেষ যোগ্যতা কী? লোকটি শান্ত গলায় বলল, আমি মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারি তার ভেতরে মানুষ না পশু লুকিয়ে আছে। রাজা কৌতূহলী হয়ে তাকে রাজপ্রসাদের সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়ার আস্তাবলের দায়িত্ব দিলেন।

কিছুদিন পরে রাজা তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় ঘোড়াটিকে কেমন দেখছ? লোকটি উত্তর দিল— মহারাজ, ঘোড়াটি বাহ্যিকভাবে খুব সুন্দর কিন্তু এটি খাঁটি জাতের নয়। রাজার মুখে বিস্ময়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞ সহিসকে ডেকে পাঠালেন। সহিস এসে ভালো করে ঘোড়াটিকে দেখে বলল— মহারাজ, ঘোড়াটি সত্যিই খাঁটি জাতের কিন্তু তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ওটার মা মারা যায়। তাই সে গোরুর দুধ খেয়ে বড়ো হয়েছে।

রাজা তখন চাকরটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে এটা বুঝলে?

সে বলল, মহারাজ, ঘোড়াটি যখন ঘাস খায় তখন গোরুর মতো মাথা নীচু করে খায়। কিন্তু খাঁটি জাতের ঘোড়া ঘাস মুখে নেওয়ার সময় মাথা উঁচু করে রাখে।

রাজা তার প্রখর বুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে প্রচুর পরিমাণ শস্য, ঘি, ছাগল, মুরগি পাঠিয়ে দিলেন তার বাড়িতে। তারপর রাজা তাকে বললেন, তুমি এখন থেকে রানির মহলে কাজ করবে।

কিছুদিন পর রাজা আবার তাঁর চাকরটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার রানি সম্পর্কে তোমার মত কী?

চাকরটি শান্তভাবে বলল— মহারাজ, রানিমা রানির মতোই। কিন্তু তাঁর আচরণ রাজকীয় নয়, তিনি জন্মসূত্রে রাজকুমারী নন।

শুনে রাজা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর শাশুড়িকে ডেকে একথা সত্য কিনা জানতে চাইলেন। শাশুড়ি কিছুটা ধরা গলায় বললেন, একথা সত্যি মহারাজ। আমার মেয়ে জন্মের পরেই মারা যায়। পরে অন্যের এক মেয়েকে আমরা দত্তক নিয়ে বড়ো করেছি। সেই মেয়েই এই রাজ্যের রানি।

রাজা চাকরটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এটা কী করে বুঝতে পারলে?

চাকরটি বলল, মহারাজ, জন্মসূত্রে রাজকুমারী ভৃত্যদের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু আমাদের রানিমা ভৃত্যদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন তারা মানুষ নয়, কেবলমাত্র আদেশ পালনের যন্ত্র।

রাজা আবারও মুগ্ধ হয়ে তাকে আরও বেশি

ভেড়া, ছাগল, শস্য, ঘি তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাকে নিজের দরবারে স্থায়ী চাকরিতে নিযুক্ত করলেন।

কয়েক মাস পরে দরবারে বসে রাজা একদিন মুচকি হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো সবার মুখ দেখে তাদের স্বরূপ বলে দিতে পারো, বলো তো আমার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?

লোকটি চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, মহারাজ, আপনি যদি অভয় দেন যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন না, তাহলে বলতে পারি।

রাজা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, অভয় দিলাম।

লোকটি মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, মহারাজ, আপনি রাজপুত্র নন। আপনার কাজকর্মে রাজকীয় ব্যবহার নেই।

শুনে রাজার চোখ-মুখ রাগে লাল হয়ে গেল কিন্তু প্রতিশ্রুতির কথা মনে করে চুপ করে রইলেন। তারপর তিনি সভাসদদের অপেক্ষা করতে বলে রাজমাতার মহলে গেলেন। শুনে রাজমাতা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, একথা সত্যি। আমরা নিঃসন্তান ছিলাম। তাই এক রাখালের শিশুকে দত্তক নিয়েছিলাম। সেই শিশুই তুমি।

রাজা দরবারে ফিরে সেই লোকটিকে বললেন, তুমি কীভাবে একথা জানলে?

লোকটি মৃদু হেসে বলল, মহারাজ, রাজারা যখন কোনো পুরস্কার দেন, তখন তাঁরা হিরে, মুক্তো বা সোনাদানা দেন। কিন্তু আপনি পুরস্কার দেন ছাগল, ভেড়া, মুরগি, শস্য, ঘি ইত্যাদি যা রাখালদের স্বভাব। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, মহারাজ একজন মানুষের আসল পরিচয় তার মুখে নয়, তার আচার আচরণে, ব্যবহারে লুকিয়ে থাকে। পদমর্যাদা বা ধনসম্পদ যতই হোক না কেন, মানুষের আসল পরিচয় তার ব্যবহারে।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

মাধব

মাধব ন্যাশনাল পার্ক মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এটি প্রথমে ১৯৫৬ সালে ১৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে শিবপুরী জাতীয় উদ্যান হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে মাধোরাও সিন্ধিয়ার নামে এর নাম রাখা হয় মাধব জাতীয় উদ্যান। বর্তমানে এর আয়তন ১৭৫১ বর্গকিলোমিটার। এই উদ্যানের মধ্যে রয়েছে সখিয়া সাগর নামে এক জলাধার, যা ২০২২ সালে রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উদ্যানটি হ্রদ, বন ও তৃণভূমির সমন্বয়ে বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্রে সমৃদ্ধ। এই উদ্যানে নীলগাই, চিঙ্কারা, চৌশিঙা কৃষ্ণসার হরিণ, চিতল, সম্বর ও বার্কিং ডিয়ার-সহ বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ বাস করে। এছাড়াও বন্য কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে, বন্য শুয়োর, সাপ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১৬

ভুতকাল: – পুংলিঙ্গে (ভাগ –২)

অভ্যাসং কুর্ম: –

যুবক: ক্রীডিতবান্।

ক: ক্রীডিতবান্?

বানর: ফলং খাতিদবান্।

স: হসিতবান। স্বপন: পত্র লিখিতবান।

ভক্ত গীতং গীতবান। সৈনিক: যুদ্ধং কৃতবান।

ছাত্র: শ্লোকম্ উক্তবান্। অহং গৃহং গতবান্।

(এরকম নানান শব্দ দিয়ে অতীতকালের বাক্য রচনা করতে হবে)

ভালো কথা

শালিকছানা

আমাদের স্কুলে যেতে রাস্তার ধারে পাকুড়গাছটায় প্রতি বছর বৈশাখমাসে অনেক পাখি বাসা বাঁধে। এসময় সব বাসায় ডিম ফুটে ছানা বের হয়। সেদিন সন্ধ্যায় খুব ঝড় হয়েছিল। পরদিন সকালে দেখি অনেক ছানা ঝড়ে মাটিতে পড়ে মরে রয়েছে। মা পাখিগুলো খুব চিৎকার করছিল। চারটে ছানা বড়ো বড়ো ঘাসের উপর পড়েছিল। ওগুলো মরেনি। আমি চারটে ছানাই বাড়িতে এনে একটা ভাঙা ঝুড়িতে রেখে দিয়েছিলাম। ছানাগুলোকে দেখেই মা খুব বকছিল। আমি কী করবো ভাবছিলাম, তখনই দেখি দুটো শালিক মুখে খাবার এনে ছানাগুলোকে খাইয়ে দিচ্ছে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বীথি মহান্তি, অষ্টমশ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

গিরগিটি

সজল মাহাত, দ্বাদশশ্রেণী, দেশবন্ধু রোড, পুরুলিয়া

ভয় পেয়ে কিংবা শিকার ধরতে
গিরগিটিরা রং বদলায়,
পশুপাখি পারে না তো
এমনতরো করতে হায়!
মানুষরা তো গিরগিটি নয়
তবে স্বার্থের জন্য বদলায় রং,
ভোটের পরে কত মানুষ
রং বদলে সাজছে সং।

মানষের এই রং বদলানোয়
গিরগিটিরা পাচ্ছে ভয়,
এমনি করে মানুষরা সব
গিরগিটিদের করবে জয়?
মানুষের এই রং বদলে
গিরগিটিদের চলছে তরজা,
রং বদলালেই কোথায় যাবে
সভাপতির বন্ধ দরজা।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

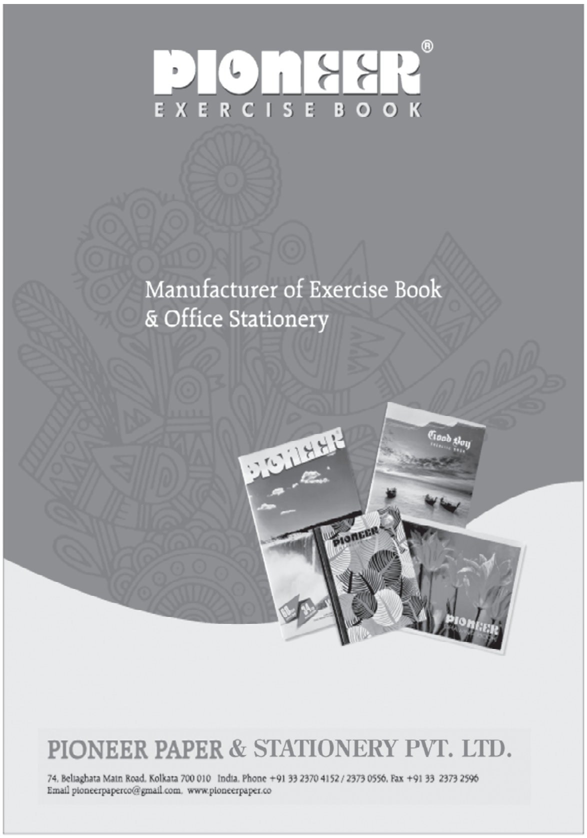

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

দেশে দেশে একটি গোপন ও সমান্তরাল প্রশাসন হিসেবে সক্রিয় দ্য গ্লোবাল ডিপ স্টেট

গিরিরাজ দে

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য, সম্ভবত প্রথমেই এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, কর্পোরেট ও আর্থিক বিভাগগুলো গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে কীভাবে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করে। ১৯৪৬ সালে জেনারেল হয়েট ভ্যানডেনবার্গ ছিলেন 'সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স' -এর পরিচালক। তিনি নিউ ইয়র্কের 'সুলিভান অ্যান্ড ক্রমওয়েল' নামক প্রতিষ্ঠানের রিপাবলিকানপন্থী আইনজীবী অ্যালেন ডালসকে আহ্বান জানান এমন কিছু প্রস্তাবনার খসড়া প্রণয়নে সহায়তা করার জন্য, যা ১৯৪৭ সালে একটি নতুন সংস্থা— সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি' (সিআইএ) গঠনের রূপরেখা তৈরি করবে। ডালস ছয় সদস্যের একটি দল গঠন করেন, যাদের মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন 'ওয়াল স্ট্রিট'-এর বিনিয়োগ ব্যাংকার কিংবা আইনজীবী। তাদের মধ্যে দু'জন-— উইলিয়াম এইচ জ্যাকসন ও ফ্রাঙ্ক উইজনার পরবর্তী পর্যায়ে সিআইএ-তে যোগ দিয়েছিলেন। মনে করা হয়, এর পরপরই ডালস বিভিন্ন দেশের সরকার বা শাসনব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করার কাজে লিপ্ত হন। তার প্রথম টার্গেট ছিল গুয়াতেমালার জ্যাকোবো আরবেনজ শাসক। কারণ গুয়াতেমালার নতুন ভূমি সংস্কার আইনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি'-র ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল— এমন একটি বিষয় যা এর আগেই 'সিএফআর'-এর বৈঠকে আলোচিত হয়েছিল। এভাবেই 'দ্য ডিপ স্টেট' বা গোপন শাসনযন্ত্র তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল।

অধ্যাপক পিটার ডেল স্কট 'দ্য ডিপ স্টেট'-কে একটি সমান্তরাল ও গোপন প্রশাসন হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা মূলত গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দ্বারা সংগঠিত এবং মাদক ব্যবসার আর্থিক মদতে পরিচালিত। এই গোপন প্রশাসনযন্ত্রটি বুদ্ধিজীবী, রিলিজিয়াস গোষ্ঠী এবং ক্ষেত্রবিশেষে খোদ সাংবিধানিক সরকারের পক্ষ থেকে আসা বিপদগুলোর বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর অবস্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন অবৈধ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। অভিধান অনুযায়ী 'দ্য ডিপ স্টেট'-এর সংজ্ঞায় এমন একদল মানুষের কথা বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে সরকারি সংস্থা বা সামরিক বাহিনীর প্রভাবশালী সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন এবং যারা গোপনে সরকারি নীতিসমূহের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন কিংবা সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে এই সংজ্ঞাটি হয়তো কিছুটা সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সংজ্ঞার আওতায় প্রভাবশালী কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব এবং গণমাধ্যম জগতের মানুষদেরও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

মার্কিন শাসনব্যবস্থায় বিদ্যমান 'রিভলভিং ডোর' বা 'ঘূর্ণায়মান দরজা'র প্রক্রিয়াটি 'দ্য ডিপ স্টেট'-এর কার্যক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো অ্যাডমিরাল মাইক ম্যাককনেলের কর্মজীবনের গতিপ্রকৃতি। তিনি জর্জ এইচ ডব্লু বুশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর ক্লিনটনের শাসনামলে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি গোয়েন্দা ঠিকাদার সংস্থা (আমেরিকান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড মিলিটারি কন্ট্র্যাক্টর)— 'বুজ অ্যালেন'-এ যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি পুনরায় জর্জ ডব্লিউ বুশ (জুনিয়র বুশ)-এর অধীনে 'জাতীয় গোয়েন্দা নির্দেশক' হিসেবে ফিরে আসেন এবং সবশেষে আবারও 'বুজ অ্যালেন'-এ নির্বাহী সহ-সভাপতি হিসেবে যোগদান করেন। ২০১৪ সালে ওবামার শাসনামলে যিনি 'জাতীয় গোয়েন্দা নির্দেশক' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সেই জেমস ক্ল্যাপারও ছিলেন 'বুজ অ্যালেন'-এর একজন প্রাক্তন নির্বাহী আধিকারিক। এটি একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা যে, কর্মরত গোয়েন্দা আধিকারিকরা প্রায়শই বিভিন্ন বেসরকারি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের হয়ে এমন সব খসড়া বা নথিপত্র প্রণয়ন করেন, যার সঙ্গে কোনো প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থ জড়িত থাকে না, অথচ অতীতে তারা হয়তো ওইসব প্রতিষ্ঠানেই কাজ করেছেন এবং ভবিষ্যতেও পুনরায় সেখানে কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। বুজ অ্যালেনের পুরো পরিচয় হলো— 'বুজ অ্যালেন হ্যামিল্টন হোল্ডিং কর্পোরেশন'। ২০০৮ সালে এটি বিভক্ত হয়ে দু'টি প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। একটি হলো 'বুজ অ্যালেন হ্যামিল্টন ইনকর্পোরেটেড', যা মূলত মার্কিন সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছিল (বর্তমানে তাদের মোট ব্যবসার ৯৯ শতাংশই এই খাতের অন্তর্ভুক্ত); এবং অন্যটি হলো নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক 'বুজ

ফ ঃ ৬

অ্যান্ড কোম্পানি', যা প্রতিষ্ঠানটির বাণিজ্যিক ও আন্তর্জাতিক পোর্টফোলিও বা কার্যক্রম পরিচালনা করত। বুজ অ্যালেন হ্যামিল্টনের মালিকানার সিংহভাগই একটি বেসরকারি ইক্যুইটি প্রতিষ্ঠান— 'কার্লাইল'-এর দখলে রয়েছে। এই সংস্থাটি বুশ পরিবারের; অর্থাৎ পিতা ও পুত্র,উভয়ের সঙ্গেই তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য সুপরিচিত। ২০০৭ সালে গোয়েন্দা খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয়কৃত মোট ৬০ বিলিয়ন ডলারের ৭০ শতাংশেরই লেনদেন হয়েছিল মূলত 'বুজ অ্যালেন' এবং 'SAIC'-র মাধ্যমে। সিআইএ-র অন্যতম পুরোনো ও বৃহত্তম 'অনুমোদিত ঠিকাদার' (cleared contractors) হিসেবে এই সংস্থাটির দীর্ঘদিনের সুনাম রয়েছে। ১৯৫৩ সালে অ্যালেন ডালসের আমল থেকেই তারা গোয়েন্দা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ১৯৫০-এর দশকে মিশর, ফিলিপাইন ও ইরানে সিআইএ-পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানেও 'বুজ অ্যালেন'-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন একটি সাম্রাজ্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়, তখন থেকেই সিআইএ-র কার্যকলাপও উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করতে থাকে।

'বিল্ডারবার্গ' গ্রুপের মতো গোপন সংগঠনগুলো যে 'গ্লোবাল ডিপ স্টেট' বা আন্তর্জাতিক গোপন শাসনযন্ত্রকে সক্রিয় করে তুলেছিল, ঠাণ্ডাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তা ক্রমশ একটি অত্যন্ত যুদ্ধার্থ রূপ পরিগ্রহ করছিল। সম্ভবত তুর্কিরাই প্রথম জাতি, যারা ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে সংঘটিত 'সুসুরলুক গাড়ি দুর্ঘটনা' কেলেঙ্কারির পর এই 'ডিপ স্টেট'-এর অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। ওই দুর্ঘটনায় নিহত তিন ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন পুলিশ প্রধান হুসায়িন কোকাদাগ; আবদুল্লাহ চাতলি যে ছিল একজন কুখ্যাত মাফিয়া সদস্য, যার সঙ্গে উগ্র-ডানপন্থী মহলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল; এবং চাতলির প্রেমিকা। গাড়ির চতুর্থ যাত্রী ছিলেন সেদাত বুচাক; যিনি কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (PKK) একজন কুর্দি সদস্য ছিলেন। এই দুর্ঘটনাটি দেশের নিরাপত্তা বাহিনী, কমিউনিস্ট-বিরোধী ও PKK-বিরোধী আধা-সামরিক গোষ্ঠীসমূহ এবং মাফিয়া চক্রের মধ্যেকার গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করে দেয়। দু'টি মেশিনগান ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ -সহ বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র, জাল পরিচয়পত্র এবং সরকারি আধিকারিকদের জন্য সংরক্ষিত একটি 'সবুজ পাসপোর্ট' ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল। কুর্দদের দমনের লক্ষ্যে নিরাপত্তা সংস্থা ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে অপরাধ জগতের যে গভীর আঁতাত বা সংযোগ রয়েছে— এই ঘটনাটি তা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবেই 'ডিপস্টেট'-এর আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে।

পাকিস্তানেও দীর্ঘকাল ধরে একটি 'ডিপ স্টেট' বা গোপন শাসনযন্ত্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান, সম্ভবত দেশটির স্বাধীনতার সূচনালগ্ন থেকেই। কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস (সিএফআর)-এর সিনিয়র ফেলো ড্যানিয়েল মার্কি এ প্রসঙ্গে বলেন— শিক্ষাবিদ ও নীতি-বিশ্লেষকরা সাধারণত এই বিষয়ে একমত যে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা 'ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স' বা আইএসআই সেদেশের অধিকাংশ মৌলিক সরকারি নীতির ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, অনির্বাচিত, অস্বচ্ছ ও গোপন 'ডিপ স্টেট'-এর পাশাপাশি সেখানে একটি প্রায়-স্থায়ী 'এস্টাব্লিশমেন্ট' বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোরও অস্তিত্ব রয়েছে। এই 'ডিপ স্টেট' মূলত রাজনীতিবিদ, বরিষ্ঠ আমলা এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সমষ্টি, যারা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দেশটির অধিকাংশ শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, পরিচালনা করেছে এবং কার্যত দেশটির মালিকানা নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছে।

পাকিস্তানের বর্তমান 'ডিপ স্টেট' বা গোপন শাসনযন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে নিঃসন্দেহে কিছু ইসলামপন্থী এবং তথাকথিত দক্ষিণপন্থী নেতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সম্ভবত মাইক লফগ্রেন তাঁর 'অ্যানাটমি অফ দ্য ডিপ স্টেট'-শীর্ষক প্রবন্ধে 'ডিপ স্টেট'-এর অন্যতম সেরা সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন। মার্কিন কংগ্রেসের একজন সাবেক কর্মী হিসেবে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক ইস্যুতে দীর্ঘ ২৮ বছরের অভিজ্ঞতা এবং 'অতি-গোপনীয়' (Top-secret) তথ্য যাচাইয়ের বিশেষ অনুমোদনের অধিকারী লফগ্রেন— এই রহস্যময় সত্তাটিকে এমন একটি 'সামাজিক নেটওয়ার্ক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা মূলত নিজেদের বিত্তবৈভব বৃদ্ধি এবং নিজেদের অস্তিত্বকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যেই পরিচালিত। বিশ্বব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বিপুল আর্থিক সম্পদের বিচারে এই সত্তাটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অনন্য এক অবস্থানে আসীন হলেও, এটি সর্বজ্ঞ বা অজেয় কোনো শক্তি নয়। এর কার্যপদ্ধতি, লক্ষ্য ও প্রভাবের মধ্যে কিছু অশুভ বা নেতিবাচক দিক বিদ্যমান থাকলেও, এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হলো, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার গভীরে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত বা গেড়ে বসে রয়েছে। সুতরাং, লিবিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক এবং বর্তমানে সিরিয়ায় নানাবিধ বিপর্যয় ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও, এই ব্যবস্থাটি নিশ্চিত করবে যে,এর শীর্ষস্থানীয় মহল যেন বারবার প্রদর্শিত অদক্ষতার প্রেক্ষিতে কোনোরকম পরিণতিরই সম্মুখীন না হয়। 'ডিপ স্টেট' বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেপথ্য শক্তি অত্যন্ত ক্ষমতাধর ও সুরক্ষিত। তবুও ব্যর্থতার মুহূর্তে এটি আত্মরক্ষার্থে গুটিয়ে যায় এবং পরিবর্তনের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে একই নীতি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যেকার যে অচলাবস্থা ২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত নানাভাবে বিরাজ করেছে, যেখানে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ট্রাম্প ও তার সহযোগীদের সঙ্গে রুশ গোয়েন্দাদের সম্ভাব্য আঁতাতের বিষয়টি তদন্ত করে বলে বিভিন্ন

সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। সে প্রসঙ্গে ডেমোক্র্যাটিক দলের কোনো কোনো রাজনৈতিক মহল থেকে এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, একটি 'ডিপ স্টেট' ঘনিষ্ঠ গোয়েন্দা গোষ্ঠীই মূলত এই তদন্তের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ক্লিনটন যখন বিপাকে পড়েছিলেন, তখন তিনি নিউ ইয়র্কে অবস্থিত 'সিএফআর'-এর দ্বারস্থ হয়েছিলেন, দৃশ্যত কোনো প্রকার পরিত্রাণ বা রেহাইয়ের আশায়। অনেকের মনে হয়েছে যে, ২০১৬ সালের নির্বাচন এই 'ডিপ স্টেট'-এর ভিত্তিমূলে বেশ বড়োসড়ো একটি ঝাঁকুনি দিয়েছে। হিলারি ক্লিনটনের ই-মেইল সংক্রান্ত বিষয়ে এফবিআই-এর প্রকাশিত তথ্যগুলো হয়তো ট্রাম্পকে নির্বাচনে জয়ী হতে সহায়তা করেছিল, অথচ সেই একই সংস্থা পরবর্তী পর্যায়ে তার বিরুদ্ধেই তদন্ত পরিচালনা করে। গ্লেন গ্রিনওয়াল্ডের মতো গোয়েন্দা- বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছেন যে, গোয়েন্দা বিভাগের অভ্যন্তরে সম্ভবত বিভিন্ন উপদলের মধ্যে একটি গোপন যুদ্ধ চলছে— যার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নাম-পরিচয়হীন সূত্রের মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী ও যাচাই-অযোগ্য তথ্য ফাঁস হওয়ার মধ্য দিয়ে। পররাষ্ট্র দপ্তর যখন মুসলমানদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল, ঠিক তখনই ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার হোয়াইট হাউস থেকেই পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ক্রমশ অধিকতর প্রভাবশালী হয়ে উঠছিলেন।

অন্যদিকে, লফগ্রেনের সংজ্ঞায় বর্ণিত 'ডিপ স্টেট'-এরই অন্তর্ভুক্ত কিছু উপাদান, যাদের মধ্যে ছিলেন ওয়াল স্ট্রিটের আইনজীবী এবং সিলিকন ভ্যালির সেই সব সদস্য, যারা মূলত একটি 'নজরদারি সরকার' (surveillance state) গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিলেন, তারাই এখন ট্রাম্প প্রশাসনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছেন। যেহেতু ট্রাম্প অতীতের সেই 'ডিপ স্টেট'-এর কাঠামো পরিবর্তন করে সেটিকে নিজের মতো করে ঢেলে সাজাতে বদ্ধপরিকর বলে মনে হচ্ছে, তাই বর্তমান সময়ের গোয়েন্দা মহলের হাতে ন্যস্ত রয়েছে অসীম ক্ষমতা।

৯/১১ হামলার জবাবে বুশ প্রশাসনের গৃহীত সামরিক পদক্ষেপ এবং সর্বব্যাপী গোয়েন্দা তৎপরতার পর বারাক ওবামা কার্যত দু'টি সরকারের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। এদের মধ্যে একটি সরকারের সঙ্গে মার্কিন নাগরিকরা পরিচিত ছিলেন এবং সেটি কম-বেশি প্রকাশ্যেই পরিচালিত হতো। অন্যটি ছিল একটি সমান্তরাল ও গোপন প্রশাসন, যা নিজস্ব এক বিশাল ও বিস্তৃত জগৎ হিসেবে পরিচালিত হতো। এটি কেবল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যাচাইকৃত একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কাছেই দৃশ্যমান ছিল। পেন্টাগনের গোয়েন্দা প্রধান জেমস ক্ল্যাপার যেমনটি স্বীকার করেছিলেন, এই গোপন সরকারের সমগ্র রূপটি 'কেবল ঈশ্বরের কাছেই দৃশ্যমান' ছিল। এমন কোনো 'ডিপ স্টেট' বা গোপন প্রশাসনের কাঠামোতে যে ওয়াল স্ট্রিট, সিএফআর এবং ট্রাইল্যাটারাল কমিশনের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিদের উপস্থিতি থাকবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

২০১৩ সালে 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর পেগি নুনান এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোনো ব্যবস্থা বিদ্যমান কি না, যা কার্যত দেশের প্রশাসনের বাইরের আবরণের ভেতরেই লুকিয়ে থাকা একটি 'ডিপ স্টেট' বা গুপ্ত শাসনযন্ত্রের সমতুল্য। এই গোপন প্রশাসনটি গঠিত আমাদের বিভিন্ন গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে নিয়ে; তাদের কার্যক্রমের বিন্যাস এতটাই বিশাল ও বিস্তৃত যে, কে কার দায়িত্বে আছেন এবং কে কী কাজ করছেন, তা তারা নিজেরাও পুরোপুরি জানেন না। হয়তো তারা এত বিপুল সংখ্যক মানুষের ওপর নজরদারি করছেন যে, জার্মানির চ্যান্সেলরের ওপর নজরদারি করাটা তাদের কাছে আর কোনো নতুন বিষয়ই মনে হয় না। হয়তো তারা বিষয়টি প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছিলেন, আবার হয়তো জানাননি। কিংবা হয়তো তারা নিজেরাই এ বিষয়ে কিছুই জানেন না।

সাবেক মার্কিন সেনেটর ল্যারি প্রেসলার যখন তাঁর 'নেইবারস ইন আর্মস' (২০১৭) গ্রন্থে 'অক্টোপাস' বা অক্টোপাস-সদৃশ কোনো শক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন তিনি মূলত 'ডিপ স্টেট' এবং মার্কিন নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় জড়িত সমস্ত গোপন সংগঠনগুলোর তাৎপর্যকেই বিশদভাবে তুলে ধরছিলেন। প্রেসলার ব্যাখ্যা করেছেন যে, কীভাবে এই 'অক্টোপাস' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টিকে রয়েছে এবং ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে; কীভাবে এটি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার ভান করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। এই প্রক্রিয়ার ক্রমবিকাশ ঘটেছে— 'দ্য পিনে সার্কল্' (The Pinay Cercle) ও 'বিল্ডারবার্গ গ্রুপ' থেকে শুরু করে; জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী সেই 'সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স' (Military-Industrial Complex)-এর দিকে এবং সেখান থেকে ঠাণ্ডাযুদ্ধ-পরবর্তী যুগে কিংবা একবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধ'-এর প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা 'সামরিক-শিল্প- প্রযুক্তি-গোয়েন্দা কমপ্লেক্স'-এর দিকে। □

শোকসংবাদ

মালদা জেলার গাজোলের স্বয়ংসেবক ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জেলা কোষাধ্যক্ষ তথা গাজোলের জাগরণ প্রমুখ জয়প্রকাশ বিশ্বাসের বাবা আনন্দ বিশ্বাস গত ৫ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, আনন্দবাবু গাজোলের গাড়াধুল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি গ্রামেগঞ্জে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অগ্রণী সৈনিক ছিলেন।

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস কেন?

ড. সম্রাট গঙ্গোপাধ্যায়

রাজ্যের নতুন পালা পরিবর্তনের পরে নবগঠিত রাজ্য সরকার অনেক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে জানা গেছে আগামী ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করা হবে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, পশ্চিমবঙ্গ দিবস বলে কি নতুন কোনো দিবস আছে? এমন তো আমরা কোথাও শুনিনি বা আমরা যখন পড়াশোনা করেছি আমাদের পাঠক্রমে সেরকমটা কিছু পড়ানো হয়নি। এমনকী কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের পালনীয় দিবসগুলির তালিকাতেও এই ২০ জুন দিনটিকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে উল্লেখ করা নেই। তাহলে এই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' এল কোথা থেকে? বা হঠাৎ করে ২০ জুন দিনটিকেই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে কেন? এর প্রেক্ষাপট জানতে হলে আমাদের একটু পিছনের দিকে ঘুরে তাকাতে হবে এবং ঐতিহাসিকভাবে এর পর্যালোচনা করতে হবে। তাহলে বুঝতে পারবো যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই ২০ জুন দিনটি কেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং কেনই-বা রাজ্য সরকার এই দিনটিকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসাবে পালন করতে চাইছে।

সাধারণত কোনো রাজ্যের 'রাজ্য দিবস' নির্ধারণ করতে হলে সেই দিনটির প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা প্রয়োজন যে সত্যিই কি ওই দিনটির সঙ্গে রাজ্যের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে কিনা?

ঘটনার সূত্রপাত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ব্রিটিশ ভাইসরয় কার্জন প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দ্বিখণ্ডিত করেন। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল 'ভাগ করো ও শাসন করো' (ডিভাইড অ্যান্ড রুল) নীতির মাধ্যমে বাঙ্গালির জাতীয়তা ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে দুর্বল করা। এর প্রতিবাদে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চার করে। বঙ্গভঙ্গের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাখিবন্ধন উৎসব পালন করে জাতিকে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়ার কাহিনি আমাদের সবারই জানা। তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের (যাতে বঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা অন্তর্ভুক্ত ছিল) জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ। ব্রিটিশদের দাবি, এত বড়ো অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করা কঠিন ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের আসল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে বাংলাভাষী মানুষদের বাঙ্গালি জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা। পূর্ববঙ্গ ও অসম নিয়ে গঠিত নতুন প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকা, যা মূলত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কেন্দ্র ছিল কলকাতা। বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই বাঙ্গালিরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। তীব্র জনআন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে কিং পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ঘোষণা করেন। ১৯১২ সালের জানুয়ারি থেকে বঙ্গভঙ্গ আনুষ্ঠানিকভাবে রদ করা হয়। তবে ব্রিটিশরা পরে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশাকে আলাদা করে অসমকে পৃথক রাজ্য করে দেয়।

> **স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— 'যে জাতি ইতিহাসকে ভুলে যায়, সে তার অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে।' তাই আমরা যদি ২০ জুন তারিখের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভুলে যাই তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির পিছনে যে ঐতিহাসিক লড়াই সংগ্রাম সেটিকে ভুলে যাব।**

এর পরে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন যখন প্রবল রূপ ধারণ করে এবং ব্রিটিশরা যখন দেখল কোনোভাবেই তারা শাসন ভারতবর্ষে চালিয়ে যেতে পারছে না। তখন শেষ মুহূর্তে তারা সিদ্ধান্ত নিল ভারতকে বিভাজন করে ক্ষমতার হস্তান্তর করার। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে তেমন কোনো সমস্যা না থাকলেও ব্রিটিশ শাসক সমস্যায় পড়ল পূর্বভারত ও পশ্চিম ভারতের বিভাজন নিয়ে। ভারতবর্ষের পূর্বভাগের বিভাজন করবার ইচ্ছা ব্রিটিশদের বহুদিনের কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের চাপে পড়ে ব্রিটিশরা রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। তারা মতামত চাইল স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে। ভারতের স্বাধীনতার বেশ কয়েক মাস আগে বঙ্গের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি, আবুল হাশিমদের মতো বেশ কয়েকজন মুসলিম লিগ নেতা এবং কংগ্রেস নেতা তথা সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়রা বঙ্গকে ভাগ না করে একটি 'যুক্তবঙ্গ'-এর পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই পরিকল্পনাকে 'ইউনাইটেড বেঙ্গল প্ল্যান' বলা হয়। ওই পরিকল্পনা একটা সময়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং মহম্মদ আলি জিন্নারও সমর্থন পেয়েছিল। কলকাতা লাগোয়া সোদপুরের খাদি আশ্রমে বেশ কয়েক দফায় গান্ধীজী এসে 'যুক্তবঙ্গ' পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনাটির ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উদ্যোগটা নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি একা ছিলেন না। বঙ্গের বুদ্ধিজীবী সবাই বঙ্গবিভাগকে সমর্থন করেছিলেন। এমনকী কংগ্রেসও সমর্থন করেছিল, কেবলমাত্র শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায় সুরাবর্দির 'যুক্তবঙ্গ' পরিকল্পনার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। দেশভাগ নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের যুক্তি ছিল, যদি বঙ্গ বিভাগ না করা হয় এবং

যদি ‘যুক্তবঙ্গ’ নামে একটি তৃতীয় স্বাধীন দেশ গঠিত হয়, তাহলে সেই যুক্তবঙ্গ একসময়ে পাকিস্তানের গ্রাসে চলে যাবে। সেই আশঙ্কা যে একদম সত্যি ছিল সেটা আমরা স্বাধীনতার পরে দেখতে পেয়েছি যে বিভক্ত পূর্ববঙ্গ পৃথক থাকতে না পেরে পাকিস্তানেরই পূর্বভাগ হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সেদিন যদি বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত না নেওয়া হতো, তাহলে তো পুরো বঙ্গ ভারত থেকে বেরিয়ে পাকিস্তানের কবলে যেত। বাঙ্গালি হিন্দুর তখন আর কোনো পৃথক পরিচয় থাকত না। যুক্তবঙ্গ যদি পাকিস্তানে চলে যেত তাহলে বাঙ্গালি হিন্দুর কী অবস্থা হতো সেটা আর ভেঙে বোঝাতে হবে না ।

বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্ধকার সময়টা শুরু হয়েছিল ৪০-এর দশকের প্রথম থেকে। মুসলিম লিগের চক্রান্তে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার চলছিল তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে ১৬ অগাস্ট ১৯৪৬ সালে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-র মাধ্যমে। দ্যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসে যে হিন্দু নরসংহার হয়েছিল, নোয়াখালির দাঙ্গায় তা চূড়ান্ত রূপ পায়। সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতেই মানুষ চাইছিল বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য একটি পৃথক ভূখণ্ড হোক সেখানে বাঙ্গালি হিন্দুরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারবে। সেই চাহিদা থেকে দাবি ওঠে যে হিন্দু বাঙ্গালিরা যুক্তবঙ্গে বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে না বরঞ্চ তাদের আলাদা রাজ্য চাই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখনকার জাতীয়তাবাদী নেতারা চাইছিলেন বঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমাংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নামে আলাদা রাজ্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত হোক।

অবশেষে আসে সেই দিন ১৯৪৭ সালের ২০ জুন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় বঙ্গ ভাগ করা হবে কিনা— সেই সিদ্ধান্তের ওপরে ভোটাভুটি হয়। মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের ভোটে বঙ্গবিভাগের বিপক্ষে রায় যায়। ১০৬টি ভোট বঙ্গ বিভাগের বিপক্ষে আর মাত্র ৩৫টি ভোট পড়েছিল পক্ষে। তার কারণ মুসলিম লিগ চাইছিল সম্পূর্ণ বঙ্গ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা একটি দেশ গড়ে উঠুক। যেখানে মুসলিম লিগ নিজেই নীতি নির্ধারণ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ভারত ভাগ হয়ে তিনটি স্বাধীন দেশ গড়ার পরিকল্পনা তাদের ছিল। যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনায় ঞ্জ একটি ভারত, অন্যটি পাকিস্তান এবং তৃতীয়টি যুক্তবঙ্গ। অপরদিকে হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমাংশের জনপ্রতিনিধিদের ভোটে ৫৮-২১ ভোটে বঙ্গ বিভাগ করার পক্ষে রায় যায়। তাদের যুক্তি ছিল বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য একটি আলাদা হোমল্যান্ড প্রয়োজন। যারা দেশমাতৃকাকে ভালোবাসেন এবং মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান তাদের জন্য বাঙ্গালি হিন্দু অস্মিতা নিয়ে ভারতবর্ষে সঙ্গে যুক্ত থাকার এই একমাত্র শেষ সুযোগ।

ভোটাভুটির ফলস্বরূপ সিদ্ধান্ত হয় বঙ্গের পশ্চিমাংশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পশ্চিমবঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বভাগ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দূরদর্শিতার ফলস্বরূপ বাঙ্গালি হিন্দুরা আজ মাথা উঁচু করে পশ্চিমবঙ্গের বুকে বাঁচতে পারছে, প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারছে। যুক্তবঙ্গ-রূপী একটি ইসলামি দেশ হওয়া থেকে বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য একটি আলাদা রাজ্য গঠন হয়েছিল এই ২০ জুন তারিখেই। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেই সময় যদি সঠিক সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে আজ পশ্চিমবঙ্গের কোনো অস্তিত্ব থাকত না।

তাই এটাকে আমরা যদি বঙ্গ ভাগের সিদ্ধান্ত হওয়ার দিন হিসাবে না দেখে যদি বিপরীতভাবে দেখি যে এই দিনে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির এবং তার ভারতভুক্তির দিন হিসেবে দেখাই সবচেয়ে সমীচীন। কোনো রাজ্যের সৃষ্টি যে ঐতিহাসিক দিনে ঘটে থাকে সেই দিনটাকেই সেই ‘রাজ্য দিবস’ হিসেবে পালন করা সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত। তাই পশ্চিমবঙ্গের যদি কোনো দিবস পালন করতে হয় তাহলে ২০ জুন দিনটাকেই ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ হিসেবে পালন করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন--- ‘যে জাতি ইতিহাসকে ভুলে যায়, সে তার অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে।’ তাই আমরা যদি ২০ জুন তারিখের সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভুলে যাই তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির পিছনে যে ঐতিহাসিক লড়াই সংগ্রাম সেটিকে ভুলে যাব।

নবনির্বাচিত রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন এই ২০ জুন দিনটিকে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করবার জন্য। অতি শীঘ্রই যাতে এই দিনটির প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেই বিষয়েও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজনৈতিক পরাধীনতার জন্য বর্তমান প্রজন্ম প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারেনি। তাই খুব শীঘ্রই যাতে মানুষ সঠিক ইতিহাস জানতে পারে তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সদর্থক পদক্ষেপ কাম্য। □

পরলোকে তুষারকান্তি মজুমদার

পঞ্চাশের দশকে বিবেকানন্দ ভাগের অন্তর্গত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ শাখার স্বয়ংসেবক, উত্তর কলকাতার অগ্রণী সংগঠন বিবেকানন্দ পাঠচক্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তথা বর্তমানে উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তুষারকান্তি মজুমদার গত ১ জুন, ছোটরাসবাড়ি, টালিগঞ্জের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। রেখে গেছেন শুধুমাত্র সহধর্মিণীকে।

শ্রীমজুমদার সুবক্তা, সুলেখক ও সুসংগঠক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নানা দায়িত্ব পালন করেছেন। জীবনবীমাতে চাকরি করার সময় বিএমএস-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার পর ১৯৯৯ সাল থেকে তিন-চার বছর স্বস্তিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে যুক্ত ছিলেন।

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন জনক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রণব দত্ত মজুমদার

কলকাতা ও নোয়াখালিতে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লিগের হিন্দু নরসংহারের কাছে কংগ্রেস নেতৃত্ব নতজানু হলো। মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশের দাবি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মেনে নেওয়া হলো। বলা যায় হিন্দুদের রক্তের বিনিময়ে ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। অবিভক্ত বঙ্গে তখন যেহেতু মুসলমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যেহেতু সেখানে মুসলিম লিগের সরকার চলছে তাই জিন্না পুরো বঙ্গপ্রদেশকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানালেন। গান্ধীজী তথা কংগ্রেস মুসলমানদের জন্য পুরো সিন্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব এবং পুরো বঙ্গপ্রদেশ জিন্নাকে ছেড়ে দিতে একরকম রাজি হয়ে গেলেন।

পুরো বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন বঙ্গের প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত একজন সদস্যও বটে। দু'টি দাঙ্গার প্রেক্ষিতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পুরো বঙ্গ যদি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তবে অবিভক্ত বঙ্গে যে প্রায় ৪৫ শতাংশ হিন্দু বসবাস করছেন— তাঁরা ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় কিছুতেই সুরক্ষিত থাকবেন না। তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করলেন বঙ্গপ্রদেশকে বিভক্ত করে হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকাগুলো আলাদা করে বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড হিসেবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অনুরূপভাবে শিখ ও হিন্দু-অধ্যুষিত পঞ্জাবের অংশও ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটা না করা হলে ভারতভাগ করা যাবে না। তিনি তাঁর এই দাবির সপক্ষে জনমত গঠনের জন্য দলমত নির্বিশেষে হিন্দু নেতাদের কাছে আবেদন জানালেন। তিনি গান্ধীজী-সহ সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের কাছেও গেলেন। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ক্রমাগত তিনি সারা বঙ্গ জুড়ে ব্যাপক জন-আন্দোলন গড়ে তুললেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ মার্চ কলকাতায় এক সম্মেলনের আহ্বান করেন তিনি। এই সম্মেলনে বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালি ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন, যেমন— ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাতত্ত্ববিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মাখনলাল চৌধুরী প্রমুখ। এই সম্মেলনে বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য আলাদা 'হোমল্যান্ড'-এর দাবিতে প্রস্তাব নেওয়া হয়। এই দাবির পক্ষে এগিয়ে এসেছিলেন— প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহা, ঐতিহাসিক ড. যদুনাথ সরকার, বিশিষ্ট সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বিশিষ্ট আইনজীবী সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিনহা), মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের একাধিক প্রতিনিধি এবং কংগ্রেস নেতা মিস্টার ঈশ্বরদাস জালান প্রমুখ। '৪৬-এর হিন্দু নরসংহারের ঘটনায় মুসলমানদের ভয়াবহ রূপ দেখে কংগ্রেসের অনেক ছোটো-বড়ো নেতাদেরও বোধোদয় হয়েছিল এবং তারাও হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদের এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। বঙ্গ জুড়ে 'তারকেশ্বর সম্মেলন'-সহ ৭৬টি জনসভা করে জনমত সংগ্রহ করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

কলকাতা-সহ পুরো বঙ্গকেই পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন জিন্না। তাই তিনি অন্য একটি কৌশলে বঙ্গপ্রদেশকে হস্তগত করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই কৌশল অনুযায়ী সুরাবর্দি বঙ্গ কংগ্রেসের যে গ্রুপটি 'খাদি কংগ্রেস' বলে পরিচিত, যাঁদের নেতা ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ, তাঁদের কাছে প্রস্তাব দিলেন--- হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য একটি আলাদা সার্বভৌম দেশ (An Independent Undivided Soverign Bengal in divided India) গঠনের জন্য। মুসলিম লিগের অভিসন্ধি ছিল কোনোরকমে টোপ দিয়ে পুরো বঙ্গকে একবার আলাদা একটি দেশ ('যুক্তবঙ্গ' বা United Soverign Bengal) বানাতে পারলে তারপর উপযুক্ত সময়ে হিন্দুদের উপর 'জেহাদ' করে ওটিকে ইসলামি দেশ বানানো বা পাকিস্তানে যোগদান কঠিন কাজ হবে না।

মাত্র কয়েক মাস আগেই কলকাতা ও নোয়াখালির বুকে মুসলমান জেহাদিদের যে ভয়াবহ তাণ্ডব হয়ে গেল, যার রক্তের দাগ তখনও মোছেনি, সেই সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ক্ষমতার লালসায় জর্জরিত, দেশের তৎকালীন কতিপয় নির্লজ্জ নেতা সেই টোপটি কিন্তু গিলেছিলেন। শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ 'খাদি কংগ্রেস'-এর নেতারা এতটাই সহজ-সরল ছিলেন যে, মুসলিম লিগের এহেন কূটচাল বা ষড়যন্ত্র তারা বুঝে উঠতে পারেননি। সুরাবর্দির পরামর্শে মহা উৎসাহে 'অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গ' গঠনের জন্য তাঁরা প্রায় রাজি হয়ে গেলেন। এতে ইন্ধন জোগালেন তৎকালীন গভর্নর ফ্রেডরিক ব্যারোজ, কমিউনিস্ট পার্টি, তপশিলি ফেডারেশনের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ।

এদের এইসব কাজকর্ম দেখে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পরলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। তিনি ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল তারকেশ্বরে 'Bengal Partition Convention' -এর আয়োজন করেন। ওই কনভেশনে তিনি জোরালো কণ্ঠে বলেন— 'বঙ্গ বিভাগ করা ছাড়া বাঙ্গালি হিন্দুদের বাঁচার কোনো রাস্তা নেই। বঙ্গ বিভাগ বাঙ্গালি হিন্দুদের জীবন মরণের প্রশ্ন। বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড আমরা চাই, এ আমাদের পেতেই হবে এবং তা এখনই, নয়তো আর কখনই তা পাওয়া হবে না'।

শরৎচন্দ্র বসু মুসলিম লিগ নেতা আবুল হাসিমের সঙ্গে মিলে অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গের সংবিধানের একটি ড্রাফ্‌টও তৈরি করে ফেলেন। সেই ড্রাফ্‌টে ছিল— 'অখণ্ড স্বাধীন

বঙ্গ'-এর Constituent Assembly-তে ৩০ জন সদস্য থাকবেন,১৬ জন মুসলমান, ১৪ জন হিন্দু। অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গের মন্ত্রীসভায় সমসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান মন্ত্রী থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী সবসময়ই হবেন একজন মুসলমান, হোম মিনিস্টার (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) হবেন একজন হিন্দু। চাকরিতে হিন্দু-মুসলমান সমান অধিকার পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অখণ্ড বঙ্গের সংবিধানের ড্রাফ্‌ট নিয়ে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে সুরাবর্দি ও কিরণশঙ্কর রায় গভর্নর ফ্রেডরিক ব্যারোজকে সঙ্গে নিয়ে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে 'অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গ'-এর প্রস্তাব রাখেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদও চুপ করে বসে থাকলেন না। তিনি ১৯৪৭ সালের ২৩ এপ্রিল ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এক গোপন বৈঠক করেন এবং তাঁকে যুক্তি দিয়ে বোঝান কেন বঙ্গ ও পঞ্জাবকে ভাগ করা দরকার— মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দু ও শিখদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। ড. শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৭ সালের ১১ মে নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে 'সুরাবর্দি-বসু-হাসিম'-এর 'অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গ' গঠনের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে এর বিহিত করতে অনুরোধ করেন এবং এর বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র আপত্তির কথাও জানিয়ে তিনি লেখেন— অখণ্ড বঙ্গেতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের হাতে বাঙ্গালি হিন্দুদের নিরাপত্তা কিছুতেই থাকবে না। বিগত দাঙ্গাগুলিই তার প্রমাণ। বাঙ্গালি হিন্দুদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করবার জন্য বঙ্গ বিভাগ করে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোকে ভারতভুক্ত করতে হবে। সর্দার প্যাটেল বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং শরৎচন্দ্র বসুর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কড়া ভাষায় লিখলেন— 'শ্রীবসু সর্বভারতীয় রাজনীতি থেকে নিজেকে তো সরিয়ে নিয়েছেনই এমনকী প্রদেশের রাজনীতিটাও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে করছেন না। দেশের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে তাঁর এরকম কাজ সমর্থন যোগ্য নয়'। এইভাবে 'অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গ' গঠনের প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়ে ড. শ্যামাপ্রসাদের অদম্য প্রয়াসে।

১৯৪৬ সালের হিন্দু নরসংহারের ভয়াবহ ঘটনাকে সামনে রেখে বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ডের দাবিতে যে তীব্র জনমত ড. শ্যামাপ্রসাদ গড়ে তুলেছিলেন; তাতে আপামর হিন্দু জনতা এবং প্রায় সব বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা যেভাবে ড. শ্যামাপ্রসাদের পিছনে এসে

দাঁড়িয়েছিলেন এবং বঙ্গপ্রদেশের কংগ্রেসের ছোটো-বড়ো হিন্দু নেতারাও যেভাবে ড. শ্যামাপ্রসাদের এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন, বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ডের দাবিকে কেন্দ্র করে দেশে যে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল— তাকে উপেক্ষা করতে পারল না সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং ব্রিটিশ-ভারত সরকার। তারা প্রমাদ গুনল যে— এরকম গোলমালের ফলে দেশ বিভাজন করে 'ক্ষমতা হস্তান্তর'-এর প্রক্রিয়াটাই আবার ভেস্তে না যায়!

এইরকম পরিস্থিতিতে, ভারত বিভাজনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৯৪৭ সালের ২ ও ৩ জুন , ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন মিটিং ডাকেন। সেই মিটিঙে উপস্থিত ছিলেন— কংগ্রেসের পক্ষে আচার্য কৃপালনী (তখন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি), জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মুসলিম লিগের পক্ষে, মহম্মদ আলি জিন্না (তখন মুসলিম লিগের সভাপতি), লিয়াকত আলি খান, আব্দুর রব নিস্তার এবং শিখ সম্প্রদায়ের নেতা সর্দার বলদেব সিংহ। এই মিটিঙে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তার প্ল্যান (যার সরকারি নাম- H M Government's Statement 3 June 1947) ব্যাখ্যা করলেন। আলোচনার পর ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মিটিঙে উপস্থিত নেতারা বঙ্গ ও পঞ্জাবকে ভাগ করে ভারত বিভাজনের প্রস্তাব মেনে নিলেন। তবে ঠিক হলো যে, বঙ্গ ও পঞ্জাব ভাগ হবে এই দুই প্রদেশের অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটির ভিত্তিতে। জিন্না প্রথম দিকে কিছুটা জেদাজেদি করলেও অবশেষে মাউন্টব্যাটেনের চাপে পড়ে এই প্রস্তাব মানতে রাজি হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন বিকেল ৩-৩০-এ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি 'হাউস অব কমন্স'-এ ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষকে বিভাজিত করে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং তার সঙ্গে বঙ্গ ও পঞ্জাবের অ্যাসেম্বলি যদি প্রস্তাব পাশ করে তবে বঙ্গ ও পঞ্জাবকে ভাগ করা হবে ।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী— ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গের অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে বঙ্গের হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমাংশকে ভারতভুক্ত করে বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ডের সিদ্ধান্ত পাকা হয়, যার নাম হয় 'পশ্চিমবঙ্গ' । অনুরূপভাবে পঞ্জাবের অ্যাসেম্বলিতেও ভোটাভুটির মাধ্যমে পঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সুতরাং ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই ১৯৪৭ সালের ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ'-এর জন্ম হয়েছিল, আর ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তার জনক।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অনমনীয় তীব্র আন্দোলনের ফলেই আজ বাঙ্গালি হিন্দুরা তাঁদের ধর্ম, সংস্কৃতি, পরম্পরা এবং হিন্দু মা-বোনেদের মান-সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচার জন্য বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড 'পশ্চিমবঙ্গ' পেয়েছে, কিন্তু বাঙ্গালি হিন্দুরা আজও ড. শ্যামাপ্রসাদকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দিতে পারেনি।

তথ্যসূত্র : (১) 'The Life and Times of Dr. Syama Prasad Mookerjee : A Complete Biography'—by Tathagata Roy. (২) 1946 The Great Calcutta Killings And Noakhali Genocide— by Dr. Dinesh Ch. Sinha, Asoke Dasgupta, Ashish Choudhury. (৩) 'বাঙ্গালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ'— ড. দীনেশ চন্দ্র সিংহ। (৪) 'পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ'— কবিশেখর কালিদাস রায়। □

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৮৪)

শরীর পরাজিত মনের কাছে

সকলের দৃষ্টিতে ডাক্তারজীর অসুস্থতা অনেকদিন ধরেই ধরা পড়ছিল কিন্তু তাই বলে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কর্মসূচি থেকে কোনো রকম ছুটি বা সংক্ষিপ্তকরণ কখনো সম্ভব হয়নি। নিজের শারীরিক অসুস্থতা, দুর্বলতা ডাক্তারজী নিজেও যে অনুভব করতেন না তা নয়। এক সময় এক পত্রে তিনি লিখেন— 'আমার শরীর এত খারাপ হয়ে গেছে যে হঠাৎ ভীষণ ডিপ্রেশন এসে যায় এবং কোনো কাজ করা বা কথা বলাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।' এমন অবস্থায়ও তাঁর কাজের গতি কখনো হ্রাস পায়নি। মনের দ্বারা শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং সর্বোপরি মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এক অলৌকিক ক্ষমতা যেন ছিল তাঁর মধ্যে। ১৯৩৯-এর মে মাসে পুনার একটি ঘটনা। ভাউরাও দেশমুখ উকিল লক্ষ্য করলেন ডাক্তারজী তাঁর ঘরে একা চুপচাপ বসে আছেন। বিমর্ষতা বোঝা না গেলেও তাঁর চিন্তাস্রোত যে কোন সুদূর অতলগামী তা বোঝা যাচ্ছিল। ভাউরাও ডাক্তারজীর ঘরে এসে এক-কথা দু' কথার পড়ে বললেন--- 'ডাক্তারজী, আপনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আপনার কষ্ট কমাবার জন্য আমরা কী করব?' ডাক্তারজী মৌন। কয়েকবার একই প্রশ্ন করার পড়ে ডাক্তারজী বললেন— 'আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, এতে আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু আমি এই প্রশ্নের প্রতি নজর দিতে চাই না।'

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারজী জিজ্ঞেস করলেন— 'আপনি আমার জন্য কী করতে চান।'

—'আমি আপনাকে দুপুরে দু' তিন ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে চাই।'

—'কিন্তু তা কেমন করে সম্ভব?'

---'দরজার কাছে একজন স্বয়ংসেবক বসিয়ে দেব। আপনার সঙ্গে কেউ দেখা করতে এলে বলে দেবে যে আপনি ঘুমোচ্ছেন। এই বলে বাইরে থেকে তাকে ফিরিয়ে দেবে।' ডাক্তারজী চুপচাপ।

রাত্রিবেলা আবার ভাউরাওজী বাবারাও সাভারকরের (ডাক্তারজীর বন্ধু) সঙ্গে পরিকল্পনা করে ডাক্তারজীর কাছে এসে বসলেন। উদ্দেশ্য সেই ডাক্তারজীর বিশ্রাম। এবার ডাক্তারজী ভাউরাওকে বললেন--- 'আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন তা বাবারাওকে জিজ্ঞেস করবেন কি?' এরপর বাবারাওকে উদ্দেশ্য করে বললেন--- 'ভাউরাও প্রশ্ন করেছেন তা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু বাবারাও বিশ্রামের প্রশ্ন উপস্থাপন করলে আমার বোধগম্য হয় না। আপনার হাঁটুর ব্যথার জন্য ডাক্তার কাশীতে আপনাকে ত্রিশ-চল্লিশ দিন বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন, কিন্তু আপনি বিশ্রাম করেছিলেন কি? তখন কাজের জন্য সেখান থেকে আপনি চলে গিয়েছিলেন কি না? তাহলে কেন! আমারও একই অবস্থা।' সকলে নিরুত্তর। এরপর ডাক্তারজী যেন আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন— 'আপনার ইচ্ছা আমি বুঝতে পারি।' 'কিন্তু আমার সে শক্তি নেই'— 'আমার সময় নেই' এই বলে কারও সঙ্গে কথা বলব না— তা আমি করতে পারি না। কারণ বিশ্রাম নিলেও বাঞ্ছিত কোনো পরিণাম হবার নয়। তাছাড়া মানসিক দৃষ্টিতে আমার পক্ষে আরাম করা সম্ভব নয়। যতটা সম্ভব ততটা আমি চেষ্টা করি। সেবারকার মতো এপ্রসঙ্গ এভাবেই সমাপ্ত হলো।

(৮৫)

অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অদ্ভুত কর্তব্যবোধ

অকোলার কার্যকর্তা হরিহর রাও পুরাডের বিবাহ। তিনি এই শুভ সমাচার চিঠিতে পুনার এক কার্যকর্তাকে জানালেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন ব্যস্ততার মধ্যে ডাক্তারজীকেই বিবাহে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে। ডাক্তারজী তখন পুনাতেই ছিলেন, আর সেই স্বয়ংসেবক হরিহররাওয়ের পত্রটি ডাক্তারজীকে দেখালেন তাতে জানা গেল ৭ মে তার বিবাহ। ডাক্তারজীর ৭ তারিখেই পুনা থেকে নাগপুরে যাওয়া স্থির ছিল। তিনি স্থির করলেন নাগপুর যাওয়ার পথে অকোলা নামে এমন ঘনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক হরিহররাওয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে অবশ্যই যোগ দেবেন। এই মর্মে তিনি পত্র লিখলেন--- 'তুমি তোমার বিবাহের কথা জানাওনি কেন? আমি ৭ মে পৌঁছাচ্ছি।' সেই মতো ডাক্তারজী ৭ মে সকালে অকোলা পৌঁছে সেই স্বয়ংসেবকের বিবাহে উপস্থিত থেকে রাতের গাড়িতে নাগপুরে এলেন। তাঁর এই ভালোবাসার কথা আজও সেখানকার স্বয়ংসেবকেরা স্মরণ করে আপ্লুত হয়।

এমনই এক আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে ডাক্তারজী বিলাসপুর গিয়েছিলেন। পুনা থেকে ফেরার পরই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সন্ধ্যায় বিবাহ, বরযাত্রীদের সঙ্গে যাওয়া, খাওয়াদাওয়া সবকিছুতেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এসবের মধ্যে তাঁর জ্বর এসে গেল যা বাড়তে বাড়তে ১০৪ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছয়। বিলাসপুর থেকে রাতেই তাঁর নাগপুর ফেরার কর্মসূচি ছিল। সারা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আত্মীয় স্বজনরা বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চাইলেন— 'জ্বর কমলে নাগপুরে যাওয়া যাবে।' ততক্ষণ সকলে এখানে বিশ্রাম করার আগ্রহ করলেন। কিন্তু ডাক্তারজীর কথা— 'কাল বিশ্বনাথরাও কেলকর একটি দল নিয়ে ভাগ্যনগর সত্যাগ্রহে যোগ দিতে যাবেন। তাকে বিদায় জানাতে আমাকে নাগপুরে যেতেই হবে।' একজন গৃহী ব্যক্তি এই অবস্থায় ডাক্তারজীকে পরামর্শ দিলেন— 'তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এখনই একটা বার্তা পাঠিয়ে দিন। তাতে অভিনন্দন জানানো হবে আবার বিশ্রামেরও সুযোগ হবে।' এর উত্তরে ডাক্তারজী দৃঢ়স্বরে বললেন— 'না তা হতে পারে না। আমাকে যেতেই হবে। আরাম করার জন্য ভগবান আমাকে সৃষ্টি করেননি।' ওরকম জ্বর নিয়েই ডাক্তারজী বিলাসপুর থেকে নাগপুর গেলেন এবং পরের দিন সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্বনাথ রাওয়ের সত্যাগ্রহের বিদায় সংবর্ধনার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস